ইসলাম
পরিচিতি

ইসলাম পরিচিতি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৬

২৯তম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪৩২
ফাল্গুন ১৪১৭
ফেব্রুয়ারী ২০১১

বিনিময় ঃ ৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

رسالة دينيات-এর বাংলা অনুবাদ
ISLAM PARICHITY (Towards Understanding Islam) by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 65.00 Only.

মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর ইসলাম সম্পর্কে লিখিত বহুসংখ্যক গ্রন্থ দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসলাম কি, জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি এবং জীবন সমস্যার ইসলামী সমাধান কি, এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জনের জন্য আজকের জনগণ তাঁরই রচিত সাহিত্যের মুখাপেক্ষী।

"রিসালায়ে দীনিয়াত" মাওলানা মওদূদী (র)-এর একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। এতে তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় ইসলামের মূল বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ ধর্ম পুস্তকের ন্যায় তিনি এ গ্রন্থে কোন গোঁড়ামী বা অন্ধত্বের প্রশ্রয় দেননি, বরং স্বচ্ছ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই প্রত্যেকটি কথা পেশ করেছেন। কথা বলার যে ভংগি কুরআন মজীদে গ্রহণ করা হয়েছে, মাওলানা মাওদূদী (র)-ও ঠিক সেই ভংগি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন এ গ্রন্থে।

এ বইখানি প্রথমত উর্দু ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সনে। তখন থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বহু উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং কলেজের প্রথম পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। এ পর্যন্ত আরবী, ইংরেজী, হিন্দী, গুজরাটী, সিন্ধী, তামিল, ফরাসী, ইন্দোনেশীয় ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভাষায়ই এ বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ বইয়ের কয়েক সংস্করণ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

এ বই থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণ যেমন ইসলামকে সঠিকরূপে জানতে পারবেন, তেমনি আলেম সমাজও এ বই থেকে শিখতে পারবেন—আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির এ শতকে-ইসলামকে পেশ করার কার্যকরী ও মনঃজয়ী ধরন এবং পদ্ধতি।

আমরা সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাসী পাঠকদের খেদমতে এই বইখানি পুনঃ পেশ করতে সমর্থ হয়েছি বলে আল্লাহর লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

ইসলাম ৭

ইসলাম নামকরণ কেন ৭

ইসলাম শব্দটির অর্থ ৭

ইসলামের তাৎপর্য ৭

কুফরের তাৎপর্য ৯

কুফরের অনিষ্টকারিতা ১০

ইসলামের কল্যাণ ১৩

ঈমান ও আনুগত্য ১৯

আনুগত্যের জন্য জ্ঞান ও প্রত্যয়ের প্রয়োজন ১৯

ঈমানের পরিচয় ২০

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম ২২

ঈমান বিল-গায়েব ২৩

নবুয়াত ২৫

পয়গাম্বরীর মূলতত্ত্ব ২৫

পয়গাম্বরের পরিচয় ২৭

পয়গাম্বরের আনুগত্য ২৮

পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমানের আবশ্যকতা ৩০

পয়গাম্বরীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩২

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াত ৩৬

নবুয়াতে মুহাম্মদীর প্রমাণ ৩৮

খতমে নবুয়াত ৪৬

খতমে নবুয়াতের প্রমাণ ৪৬

ঈমানের বিবরণ ৪৯

আল্লাহর প্রতি ঈমান ৫০

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র অর্থ ৫১

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র প্রকৃত তাৎপর্য ৫১

মানব জীবনে তাওহীদ বিশ্বাসের প্রভাব ৫৭

আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ৬১

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ৬৩

আল্লাহর রাসূলদের প্রতি ঈমান	৬৭
আখেরাতের উপর ঈমান	৬৯
আখেরাত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা	৭০
আখেরাত বিশ্বাসে সত্যতা	৭৩
কালেমায়ে তাইয়েবা	৭৬
ইবাদাত	**৭৭**
ইবাদাতের তাৎপর্য	৭৮
সালাত	৭৯
সওম	৮২
যাকাত	৮৩
হজ্জ	৮৫
ইসলামের সহায়তা	৮৭
দ্বীন ও শরীয়াত	**৮৯**
দ্বীন ও শরীয়াতের পার্থক্য	৮৯
শরীয়াতের বিধান জানার মাধ্যম	৯০
ফিকাহ	৯০
তাসাউফ	৯২
শরীয়াতের বিধি-বিধান	**৯৫**
শরীয়াতের নীতি	৯৫
চতুর্বিদ অধিকার	৯৭
আল্লাহর অধিকার	৯৮
নিজস্ব অধিকার	১০১
বান্দাদের অধিকার	১০৩
আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার	১০৯
বিশ্বজনীন ও স্থায়ী বিধান	১১০

ইসলাম

ইসলাম নামকরণ কেন

দুনিয়ায় যত রকম ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে। অথবা যে জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন, ঈসায়ী ধর্মের নাম রাখা হয়েছে তার প্রচারক হযরত ঈসা (আ)-এর নামে। বৌদ্ধ ধর্ম মতের নাম রাখা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বুদ্ধের নামে। জরদশ্‌তি ধর্মের নামও হয়েছে তেমনি তার প্রতিষ্ঠাতা জরদশ্‌তের নামে। আবার ইয়াহুদী ধর্ম জন্ম নিয়েছিল ইয়াহুদা নামে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে। দুনিয়ায় আরো যেসব ধর্ম রয়েছে, তাদেরও নামকরণ হয়েছে এমনিভাবে। অবশ্যি নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে তার নামের সংযোগ নেই। বরং 'ইসলাম' শব্দটির অর্থের মধ্যে আমরা একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাই, সেই গুণই প্রকাশ পাচ্ছে এ নামে। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন এক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোন এক জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন বিশেষ ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির সম্পত্তি নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইসলামের গুণরাজি সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কওমের যেসব খাঁটি ও সৎলোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেছে, তাঁরা ছিলেন 'মুসলিম'। এ ধরনের লোক আজো রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

ইসলাম শব্দটির অর্থ

আরবী ভাষায় 'ইসলাম' বলতে বুঝায় আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে 'ইসলাম'।

ইসলামের তাৎপর্য

সকলেই দেখতে পাচ্ছে যে, চন্দ্র, সূর্য, তারা এবং বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি চলছে এক অপরিবর্তনীয় বিধান মেনে। সেই বিধানের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। দুনিয়া এক নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলছে এক নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। তার চলার জন্য যে সময়, যে গতি ও পথ নির্ধারিত রয়েছে, তার কোন পরিবর্তন নেই কখনো। পানি আর হাওয়া, তাপ আর আলো—সব কিছুই কাজ করে যাচ্ছে এক সঠিক নিয়মের অধীন হয়ে। জড়, গাছপালা, পশু-পাখীর রাজ্যেও রয়েছে তাদের নিজস্ব নিয়ম। সেই নিয়ম মুতাবিক তারা পয়দা

হয়, বেড়ে ওঠে, ক্ষয় হয়, বাঁচে ও মরে। মানুষের অবস্থা চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, সেও এক বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এক নির্দিষ্ট জীবতাত্ত্বিক বিধান অনুযায়ী সে জন্মে, শ্বাস গ্রহণ করে, পানি, খাদ্য, তাপ ও আলো আত্মস্থ করে বেঁচে থাকে। তার হৃৎপিণ্ডের গতি, তার দেহের রক্ত প্রবাহ, তার শ্বাস-প্রশ্বাস একই বাঁধাধরা নিয়মের অধীন হয়ে চলেছে। তার মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, শিরা-উপশিরা, পেশীসমূহ, হাত, পা, জিভ, কান, নাক— এক কথায় তার দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে সেই একই পদ্ধতিতে যা তাদের প্রতেকের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

যে শক্তিশালী বিধানের অধীনে চলতে হচ্ছে দুনিয়া জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সবকিছু, তা হচ্ছে এক মহাশক্তিমাণ বিধানকর্তার সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টি এবং সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থ এ বিধানকর্তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং সবই মেনে চলে তাঁরই দেয়া নিয়ম। আগেই আমি বলেছি যে, দুনিয়া-জাহানের প্রভু আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম, তাই এদিক দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। চন্দ্র, সূর্য, তারা, গাছপালা, পাথর ও জীব-জানোয়ার সবাই মুসলিম। যে মানুষ আল্লাহকে চেনে না, যে তাঁকে অস্বীকার করে, যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পূজা করে এবং যে আল্লাহর কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার করে, স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে সেও মুসলিম, কারণ তার জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর বিধানের অনুসারী। তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ, তার দেহের প্রতিটি অণু ইসলাম মেনে চলে কারণ তার সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও গতি সবকিছুই আল্লাহর দেয়া নিয়মের অধীন। মূর্খতাবশত যে জিহ্বা দিয়ে সে শিরক ও কুফরের কথা বলছে, প্রকৃতির দিক দিয়ে তাও মুসলিম। যে মাথাকে জোরপূর্বক আল্লাহ ছাড়া অপরের সামনে অবনত করছে, সেও জন্মগতভাবে মুসলিম, অজ্ঞতার বশে যে হৃদয় মধ্যে সে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা পোষণ করে, তাও সহজাত প্রকৃতিতে মুসলিম। তারা সবাই আল্লাহর নিয়মের অনুগত এবং তাদের সব কাজ চলছে এ নিয়মের অনুসরণ করে।

এবার আর এক আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখা যাক।

প্রকৃতির লীলাখেলার মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের রয়েছে দু'টি দিক। এক দিকে সে অন্যান্য সৃষ্টির মতোই জীব-জগতের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা রয়েছে। তাকে মেনে চলতে হয় সেই নিয়ম। অপরদিকে, তার রয়েছে জ্ঞানের অধিকার, চিন্তা করে বুঝে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ক্ষমতা তার করায়ত্ত। নিজের ইখতিয়ার অনুযায়ী কোন বিশেষ মতকে সে মেনে চলে, আবার কোন বিশেষ

মতকে সে অমান্য করে কোন পদ্ধতি সে পসন্দ করে, কোন বিশেষ পদ্ধতিকে আবার পসন্দ করে না। জীবনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কখনো কোন নিয়ম-নীতিকে সে স্বেচ্ছায় তৈরী করে নেয়, কখনো বা অপরের তৈরী নিয়ম-নীতিকে নিজের করে নেয়। এদিক দিয়ে সে দুনিয়ার অন্যবিধ সৃষ্ট পদার্থের মতো একই ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন নয়, বরং তাকে দেয়া হয়েছে নিজস্ব চিন্তা, মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা।

মানবজীবনে এ দু'টি দিকেরই রয়েছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষ দুনিয়ার অপর সব পদার্থের মতই জন্মগত মুসলিম এবং আমি আগে যা বলেছি সেই অনুসারে মুসলিম হতে সে বাধ্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মুসলিম হওয়া বা না হওয়ার উভয়বিধ ক্ষমতা তার মধ্যে রয়েছে এবং এ নির্বাচন ক্ষমতার প্রভাবেই মানুষ বিভক্ত হয়েছে দুটি শ্রেণীতে।

এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা, যারা তাদের স্রষ্টাকে চিনেছে, তাকেই তাদের একমাত্র মনিব ও মালিক বলে মেনে নিয়েছে এবং যে ব্যাপারে তাদেরকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেখানেও তারই নির্ধারিত কানুন মেনে চলবার পথই তারা বেছে নিয়েছে, তারা হয়েছে পরিপূর্ণ মুসলিম। তাদের ইসলাম হয়েছে পূর্ণাঙ্গ। কারণ তাদের জীবনই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহতে সমর্পিত। না জেনে-শুনে যার নিয়মের আনুগত্য তারা করছে জেনে-শুনেও তারই আনুগত্যের পথই তারা অবলম্বন করেছে। অনিচ্ছায় তারা আল্লাহর বাধ্যতার পথে চলেছিল, স্বেচ্ছায়ও তাঁরই বাধ্যতার পথ তারা বেছে নিয়েছে। তারা হয়েছে এখন সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী। কারণ যে আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন জানবার ও শিখবার ক্ষমতা, সেই আল্লাহকেই তারা জেনেছে। এখন তারা হয়েছে সঠিক যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, যে আল্লাহ্ তাদেরকে চিন্তা করবার, বুঝবার ও সঠিক সিদ্ধান্ত কায়েম করবার যোগ্যতা দিয়েছে, চিন্তা করে ও বুঝে তারা সেই আল্লাহরই আনুগত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাদের জিহ্বা হয়েছে সত্যভাষী, কেননা সেই প্রভুত্বের স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে তারা, যিনি তাদেরকে দিয়েছেন কথা বলবার শক্তি। এখন তাদের পরিপূর্ণ জীবনই হয়েছে পূর্ণ সত্যাশ্রয়ী। কারণ ইচ্ছা-অনিচ্ছার উভয় অবস্থায়ই তারা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী। সমগ্র সৃষ্টির সাথেই তাদের মিতালী। কারণ সৃষ্টির সকল পদার্থ যার দাসত্ব করে যাচ্ছে, তারাও করেছে তাঁরই দাসত্ব। দুনিয়ার বুকে তারা হচ্ছে আল্লাহর খলীফা (প্রতিনিধি) সারা দুনিয়া এখন তাদেরই এবং তারা হচ্ছে আল্লাহর।

কুফরের তাৎপর্য

যে মানুষের কথা উপরে বলা হলো, তার মুকাবিলায় রয়েছে আর এক শ্রেণীর মানুষ। সে মুসলিম হয়েই পয়দা হয়েছে এবং না জেনে, না বুঝে

জীবনভর মুসলিম হয়েই থেকেছে। কিন্তু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে আল্লাহকে চেনেনি এবং নিজের নির্বাচন ক্ষমতার সীমানার মধ্যে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে। এ ধরনের লোক হচ্ছে কাফের। 'কুফর' শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে কোন কিছু ঢেকে রাখা বা গোপন করা। এ ধরনের লোককে 'কাফের' (গোপনকারী) বলা হয়, কারণ সে তার আপন স্বভাবের উপর ফেলেছে অজ্ঞতার পর্দা। সে পয়দা হয়েছে ইসলামী স্বভাব নিয়ে। তার সারা দেহ ও দেহের প্রতিটি অংগ কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী স্বভাবের উপর। তার পারিপার্শ্বিক সারা দুনিয়া চলছে ইসলামের পথ ধরে। কিন্তু তার বুদ্ধির উপর পড়েছে পর্দা। সারা দুনিয়ার এবং তার নিজের সহজাত প্রকৃতি সরে গেছে তার দৃষ্টি থেকে। সে এ প্রকৃতির বিপরীত চিন্তা করেছে। তার বিপরীতমুখী হয়ে চলবার চেষ্টা করেছে।

এখন বুঝা গেল, যে মানুষ কাফের, সে কত বড় বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

কুফরের অনিষ্টকারিতা

'কুফর' হচ্ছে এক ধরনের মূর্খতা, বরং কুফরই হচ্ছে আসল মূর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে অজ্ঞ হয়ে থাকলে তার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে ? এক ব্যক্তি দিন-রাত দেখেছে, সৃষ্টির এত বড় বিরাট কারখানা চলেছে, অথচ সে জানে না, কে এ কারখানার স্রষ্টা ও চালক। কে সে কারিগর, যিনি কয়লা, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও আরো কয়েকটি পদার্থ মিলিয়ে অস্তিত্বে এনেছেন মানুষের মত অসংখ্য অতুলনীয় সৃষ্টিকে ? মানুষ দুনিয়ার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পাচ্ছে এমন সব বস্তু ও কার্যকলাপ, যার ভিতরে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিতবিদ্যা, রসায়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অপূর্ব পূর্ণতার নিদর্শন; কিন্তু সে জানে না, অসাধারণ সীমাহীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ কোন্ সে সত্তা চালিয়ে যাচ্ছেন সৃষ্টির এসব কার্যকলাপ। ভাবা দরকার যে মানুষ জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের খবরও জানে না, কি করে তার দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হবে সত্যিকার জ্ঞানের তোরণদ্বার ? যতই চিন্তা-ভাবনা করুক, যতই অনুসন্ধান করুক, সে কোন দিকেই পাবে না সরল-সঠিক নির্ভরযোগ্য পথ, কেননা তার প্রচেষ্টার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি সব স্তরেই দেখা যাবে অজ্ঞতার অন্ধকার।

কুফর একটি যুলুম, বরং সবচেয়ে বড় যুলুমই হচ্ছে এ কুফর। যুলুম কাকে বলে ? যুলুম হচ্ছে কোন জিনিস থেকে তার সহজাত প্রকৃতির খেলাপ কাজ যবরদস্তি করে আদায় করে নেয়া ? আগেই জানা গেছে যে, দুনিয়ায় যত জিনিস রয়েছে, সবাই আল্লাহর ফরমানের অনুসারী এবং তাদের সহজাত

প্রকৃতি (ফিতরাত) হচ্ছে 'ইসলাম' অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের আনুগত্য। মানুষের দেহ ও তার প্রত্যেকটি অংশ এ প্রকৃতির উপর জন্ম নিয়েছে। অবশ্যি আল্লাহ এসব জিনিসকে পরিচালনা করবার কিছুটা স্বাধীনতা মানুষকে দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসের সহজাত প্রকৃতির দাবী হচ্ছে এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে যেন কাজে লাগানো হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি 'কুফর' করছে সে তাকে লাগাচ্ছে তার প্রকৃতি বিরোধী কাজে। সে নিজের দিলের মধ্যে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রেম ও ভীতি পোষণ করছে অথচ তার দিলের প্রকৃতি দাবী করছে যে, সে তার মধ্যে একমাত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রেম ও ভীতি পোষণ করবে। সে তার অংগ-প্রত্যংগ আর দুনিয়ায় তার আধিপত্যের অধীন সব জিনিসকে কাজে লাগাচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা বিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অথচ তাদের প্রকৃতির দাবী হচ্ছে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর বিধান মুতাবিক কাজ আদায় করা। এমনি করে যে লোক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর এমন কি, নিজের অস্তিত্বের উপর ক্রমাগত যুলুম করে যাচ্ছে, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে ?

'কুফর' কেবল যুলুমই নয়, বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামিও বটে। ভেবে দেখা যাক, মানুষের আপন বলতে কি জিনিস আছে। নিজের মস্তিষ্ক সে নিজেই পয়দা করে নিয়েছে না আল্লাহ পয়দা করেছেন ? নিজের দিল, চোখ, জিভ, হাত-পা, আর সব অংগ-প্রত্যংগ—সবকিছুর স্রষ্টা সে নিজে, না আল্লাহ ? তার চারপাশে যত জিনিস রয়েছে, তার স্রষ্টা মানুষ না আল্লাহ এসব জিনিস মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী করে তৈরী করা এবং মানুষকে তা কাজে লাগাবার শক্তি দান করা কি মানুষের নিজের না আল্লাহর কাজ ? সকলেই বলবে, আল্লাহরই এসব জিনিস, তিনিই এগুলো পয়দা করেছেন, তিনিই সব কিছুর মালিক এবং আল্লাহর দান হিসেবেই মানুষ আধিপত্য লাভ করেছে এসব জিনিসের উপর। আসল ব্যাপার যখন এই তখন যে লোক আল্লাহর দেয়া মস্তিষ্ক থেকে আল্লাহরই ইচ্ছার বিপরীত চিন্তা করার সুবিধা আদায় করে নেয়, তার চেয়ে বড় বিদ্রোহী আর কে ? আল্লাহ তাকে চোখ, জিভ, হাত-পা এবং আরো কত জিনিস দান করেছেন, তা সবকিছুই সে ব্যবহার করেছে আল্লাহর পসন্দ ও ইচ্ছা বিরোধী কাজে। যদি কোন ভৃত্য তার মনিবের নেমক খেয়ে তার বিশ্বাসের প্রতিকূল কাজ করে যায়, তবে তাকে সকলেই বলবে নেমকহারাম। কোন সরকারী অফিসার যদি সরকারের দেয়া ক্ষমতা সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে থাকে, তাকে বলা হবে বিদ্রোহী। যদি কোন ব্যক্তি তার উপকারী বন্ধুর সাথে প্রতারণা করে সকলেই বিনা দ্বিধায় তাকে বলবে অকৃতজ্ঞ। কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার

বাস্তবতা কতখানী ? মানুষ মানুষকে আহার দিচ্ছে কোত্থেকে ? সে তো আল্লাহরই দেয়া আহার। সরকার তার কর্মচারীদেরকে যে ক্ষমতা অর্পণ করে, সে ক্ষমতা এলো কোত্থেকে ? আল্লাহই তো তাকে রাজ্য পরিচালনার শক্তি দিয়েছেন। কোন উপকারী ব্যক্তি অপরের উপকার করছে কোত্থেকে ? সবকিছুই তো আল্লাহর দান। মানুষের উপর সবচেয়ে বড় হক বাপ-মার। কিন্তু বাপ-মার অন্তরে সন্তান বাৎসল্য উৎসারিত করেছেন কে ? মায়ের বুকে স্তন দান করেছেন কে ? বাপের অন্তরে কে এমন মনোভাব সঞ্চার করেছেন, যার ফলে তিনি নিজের কঠিন মেহনতের ধন সানন্দে একটা নিষ্ক্রিয় মাংসপিণ্ডের জন্য লুটিয়ে দিচ্ছেন এবং তার লালন-পালন ও শিক্ষার জন্য নিজের সময়, অর্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কুরবান করে দিচ্ছেন ? যে আল্লাহ মানুষের আসল কল্যাণকারী, প্রকৃত বাদশাহ, সবার বড় পরওয়ারদিগার, মানুষ যদি তাঁর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে, তাঁকে আল্লাহ বলে না মানে, তাঁর দাসত্ব অস্বীকার করে, আর তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামী আর কি হতে পারে। কখনো মনে করা যেতে পারে যে, কুফরী করে মানুষ আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারছে। যে বাদশাহর সাম্রাজ্য এত বিপুল-বিরাট যে, বৃহত্তম দূরবীন লাগিয়েও আমরা আজো স্থির করতে পারিনি কোথায় তার শুরু আর কোথায় শেষ। যে বাদশাহ এমন প্রবল প্রতাপশালী যে, তাঁর ইশরায় আমাদের এ পৃথিবী, সূর্য, মঙ্গলগ্রহ এবং আরো কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ বলের মতো চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে বাদশাহ এমন অফুরন্ত সম্পদশালী যে, সারা সৃষ্টির আধিপত্যে কেই তাঁর অংশীদার নেই, যে বাদশা এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল যে, সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী অথচ তিনি কারুর মুখাপেক্ষী নন, মানুষের এমন কি অস্তিত্ব আছে যে তাঁকে মেনে বা না মেনে সেই বাদশাহর কোনো অনিষ্ট করবে ? কুফর ও বিদ্রোহের পথ ধরে মানুষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না, বরং নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ খোলাসা করে।

কুফর ও নাফরমানী অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এই যে, এর ফলে মানুষ চিরকালের জন্য ব্যর্থ ও হতাস হয়ে যায়। এ ধরনের লোক জ্ঞানের সহজ পথ কখনো পাবে না, কারণ যে জ্ঞান আপন স্রষ্টাকে জানে না, তার পক্ষে আর কোন জিনিসের সত্যিকার পরিচয় লাভ অসম্ভব। তার বুদ্ধি সর্বদা চালিত হয় বাঁকা পথ ধরে, কারণ সে তার স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে গিয়ে ভুল করে, আর কোন জিনিসকেও সে বুঝতে পারে না নির্ভুলভাবে। নিজের জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপে তার ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা অবধারিত। তার নীতিবোধ, তার কৃষ্টি, তার সমাজ ব্যবস্থা, তার জীবিকা অর্জন পদ্ধতি, তার শাসন–পরিচালন ব্যবস্থা

ও রাজনীতি, এক কথায় তার জীবনের সর্ববিধ কার্যকলাপ বিকৃতির পথে চালিত হতে বাধ্য। দুনিয়ার বুকে সে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে, খুন-খারাবি করবে, অপরের অধিকার হরণ করবে, অত্যাচার উৎপীড়ন করবে। বদখেয়াল, অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কৃতি দিয়ে তার নিজের জীবনকেই করে তুলবে তিক্ত-বিস্বাদ। তারপর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন আখেরাতের দুনিয়ায় পৌছবে, তখন জীবনভর যেসব জিনিসের উপর সে যুলুম করে এসেছে, তারা তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। তার মস্তিষ্ক, তার দিল, তার চোখ, তার কান, তার হাত-পা এক কথায় তার সব অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহর আদালতে অভিযোগ করে বলবে ঃ এ আল্লাহদ্রোহী যালেম তার বিদ্রোহের পথে জবরদস্তি করে আমাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়েছে। যে দুনিয়ার বুকে সে নাফরমানীর সাথে চলেছে ও বসবাস করেছে, যে জীবিকা সে অবৈধ পন্থায় অর্জন করেছে, যে সম্পদ সে হারাম পথে রোযগার করে হারামের পথে ব্যয় করেছে, অবাধ্যতার ভিতর দিয়ে যেসব জিনিস সে জবরদখল করেছে, যেসব জিনিস সে তার বিদ্রোহের পথে কাজে লাগিয়েছে, তার সবকিছুই ফরিয়াদী হয়ে হাযির হবে তাঁর সামনে এবং প্রকৃত ন্যায় বিচারক আল্লাহ সেদিন মযলুমদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে বিদ্রোহীকে দিবেন অপমানকর শাস্তি।

ইসলামের কল্যাণ

এতো গেলো কুফরের অনিষ্টকারিতা। এবার আমরা দেখবো ইসলামের পথ ধরলে কি কি কল্যাণ লাভ করা যায়।

উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেছে যে, এ দুনিয়ার প্রত্যেক দিকে ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহর কর্তৃত্বের অসংখ্য নিদর্শন। সৃষ্টির এ বিপুল বিরাট যে কারখানা চলছে এক সুসম্পন্ন বিধান ও অটল কানুনের অধীন হয়ে, তাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তার স্রষ্টা ও পরিচালক এক মহাশক্তিমান শাসক—যাঁর ব্যবস্থাপনায় কেউ অবাধ্য হয়ে থাকতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টির মত মানুষেরও প্রকৃতি হচ্ছে তার আনুগত্য। কাজেই অচেতনভাবে সে রাত-দিন তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে, কারণ তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূল আচরণ করে সে বেঁচেই থাকতে পারে না।

কিন্তু আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান আহরণের যোগ্যতা, চিন্তা ও উপলব্ধি করার শক্তি এবং সৎ ও অসতের পার্থক্য বুঝবার ক্ষমতা দিয়ে তাকে ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতার কিছুটা আযাদী দিয়েছেন। আসলে এ আযাদীর ভিতরেই মানুষের পরীক্ষা, তার জ্ঞানের পরীক্ষা, তার যুক্তির পরীক্ষা, তার পার্থক্য অনুভূতির পরীক্ষা। এছাড়া তাকে যে আযাদী দেয়া হয়েছে, কিভাবে সে তা

ব্যবহার করছে, তারও পরীক্ষা এর মধ্যে। এ পরীক্ষায় কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি, কারণ বাধ্যতা আরোপ করলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই হয় ব্যাহত। এ কথা প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, প্রশ্নপত্র হাতে দেয়ার পর যদি পরীক্ষার্থীকে কোন বিশেষ ধরনের জবাব দিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে ধরনের পরীক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। পরীক্ষার্থীর আসল যোগ্যতা তো কেবল তখনই প্রমাণিত হবে, যখন তাকে প্রত্যেক ধরনের জবাব পেশ করবার স্বাধীনতা দেয়। সে সঠিক জবাব দিতে পারলে হবে সফল এবং আগামী উন্নতির দরযা খুলে যাবে তার সামনে। আর ভুল জবাব দিলে হবে অকৃতকার্য এবং অযোগ্যতার দরুন নিজেই নিজের উন্নতির পথ করবে অবরুদ্ধ। ঠিক তেমনি করেই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এ পরীক্ষায় যে কোন পথ অবলম্বন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে এখন এক ব্যক্তির কথা বলা যায়, যে নিজের ও সৃষ্টির সহজাত প্রকৃতি উপলব্ধি করেনি, স্রষ্টার সত্ত্বা ও গুণরাজি চিনতে যে ভুল করেছে এবং মুক্তবুদ্ধির যে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে, তার সাহায্যে না-ফরমানী ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে চলেছে। এ ব্যক্তি জ্ঞান, যুক্তি, পার্থক্য-অনুভূতি ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হয়েছে। সে নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে প্রত্যেক দিক দিয়েই নিকৃষ্ট স্তরের লোক। তাই উপরে বর্ণিত পরিণামই তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

অন্যদিকে রয়েছে আর এক ব্যক্তি, যে এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে সে জ্ঞান ও যুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আল্লাহকে জেনেছে ও মেনেছে, যদিও এ পথ ধরতে তাকে বাধ্য করা হয়নি। সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে সে ভুল করেনি এবং নিজস্ব স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা দ্বারা সে সৎ পথই বেছে নিয়েছে, অথচ অসৎ পথের দিকে চালিত হবার স্বাধীনতা তার ছিল। সে আপন সহজাত প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেছে, আল্লাহকে চিনেছে এবং না-ফরমানীর স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে। সে তার যুক্তিকে ঠিক পথে চালিত করেছে। চোখ দিয়ে ঠিক জিনিসই দেখেছে, কান দিয়ে ঠিক কথা শুনেছে, মস্তিষ্ক চালনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত করেছে বলেই পরীক্ষায় সে সাফল্য-গৌরবের অধিকারী হয়েছে। সত্যকে চিনে নিয়ে সে প্রমাণ করেছে যে, সত্য সাধক এবং সত্যের সামনে মস্তক অবনত করে দেখিয়েছে যে, সে সত্যের পূজারী।

এ কথায় সন্দেহ নেই যে, যার মধ্যে এসব গুণরাজির সমাবেশ হয়, সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের অধিকারী হয়ে থাকে।

এ শ্রেণীর লোক জ্ঞান ও যুক্তির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সঠিক পথ অবলম্বন করবে, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্তাকে উপলব্ধি করেছে এবং তাঁর গুণরাজির পরিচয় লাভ করেছে, সেই জ্ঞানের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবকিছুই জেনেছে এ ধরনের লোক কখনো বিভ্রান্তির পথে চলতে পারে না, কারণ শুরুতেই সে পদক্ষেপ করেছে সত্যের দিকে এবং তার সর্বশেষ গন্তব্য লক্ষ্যকেও সে জেনে নিয়েছে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে। এরপর সে দার্শনিক চিন্তা ও অনুসন্ধানের মারফতে সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু কাফের দার্শনিকের মতো কখনো সংশয়-সন্দেহের বিভ্রান্তি-স্তূপের মধ্যে নিমজ্জিত হবে না। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে প্রাকৃতিক নিয়মকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করবে, সৃষ্টির লুক্কায়িত ধনভাণ্ডারকে নিয়ে আসবে প্রকাশ্য আলোকে। দুনিয়ায় ও মানুষের দেহে আল্লাহ যে শক্তিসমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তার সবকিছুরই সন্ধান করে সে জেনে নেবে। যমীন ও আসমানে যত পদার্থ রয়েছে, তার সব কিছুকে কাজে লাগাবার সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান সে করবে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা তাকে প্রতি পদক্ষেপে ফিরিয়ে রাখবে বিজ্ঞানের অপব্যবহার থেকে। আমিই এসব জিনিসের মালিক, প্রকৃতিকে আমি জয় করেছি, নিজের লাভের জন্য আমি বিজ্ঞানকে কাজে লাগাব, দুনিয়ায় আনব ধ্বংস-তাণ্ডব, লুট-তরাজ ও খুন-খারাবি করে সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করব আমার শক্তির আধিপত্য, এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর চিন্তায় সে কখনো নিমজ্জিত হবে না। এ হচ্ছে কাফের বিজ্ঞানীর কাজ। মুসলিম বিজ্ঞানী যত বেশী করে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অর্জন করবে, ততোই বেড়ে যাবে আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস এবং ততোই সে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবে। তার মনোভাব হবে ঃ 'আমার মালিক আমায় যে শক্তি দিয়েছেন এবং যেভাবে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, তা থেকে আমার নিজের ও দুনিয়ার সকল মানুষের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা আমি করবো।' এ হচ্ছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পথ।

অনুরূপভাবে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যবিধ শাখায় মুসলিম তার গবেষণা ও কর্মতৎপরতার দিক দিয়ে কাফেরের পিছনে পড়ে থাকবে না, কিন্তু দু'জনের দৃষ্টিভংগি হবে স্বতন্ত্র। মুসলিম প্রত্যেক জ্ঞানের চর্চা করবে নির্ভুল দৃষ্টিভংগি নিয়ে, তার সামনে থাকবে এক নির্ভুল লক্ষ্য এবং সে পৌছবে এক নির্ভুল সিদ্ধান্তে। ইতিহাসে মানব জাতির অতীত দিনের পরীক্ষা থেকে সে গ্রহণ করবে শিক্ষা, খুঁজে বের করবে জাতিসমূহের উত্থান-পতনের সঠিক কারণ, অনুসন্ধান করবে তাদের তাহযীব তামাদ্দুনের কল্যাণকর দিক। ইতিহাসে বিবৃত সৎ মানুষদের অবস্থা আলোচনা করে সে উপকৃত হবে। যেসব কারণে অতীতের বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তা থেকে

বেঁচে থাকবে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের এমন অভিনব পন্থা সে খুঁজে বের করবে, যাতে সকল মানুষের কল্যাণ হতে পারে, কেবল একজনের কল্যাণ ও অসংখ্য মানুষের অকল্যাণ তার লক্ষ্য হবে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ মনোযোগ থাকবে এমন এক লক্ষ্য অর্জনের দিকে যাতে দুনিয়ায় শান্তি, ন্যায়-বিচার, সততা ও মহত্ত্বের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোন ব্যক্তি বা দল আল্লাহর বান্দাহদেরকে নিজের বান্দায় পরিণত করতে না পারে, শাসন ক্ষমতা ও সম্পূর্ণ শক্তিকে আল্লাহর আমানত মনে করা হয় এবং তা ব্যবহার করা হয় আল্লাহর বান্দাহদের কল্যাণে। আইনের ক্ষেত্রে সে বিবেচনা করবে, যাতে ন্যায় ও সুবিচারের সাথে মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং কোন প্রকারে কারুর উপর অন্যায় যুলুম হতে না পারে।

মুসলিম চরিত্রে থাকবে আল্লাহ ভীতি, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়নতা। সবকিছুরই মালিক আল্লাহ, এ ধারণা নিয়ে সে বাস করবে দুনিয়ার বুকে। আমার ও দুনিয়ায় মানুষের দখলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর দান। কোন জিনিসের এমন কি আমার নিজের দেহের ও দেহের শক্তির মালিকও আমি নিজে নই। সবকিছুই আল্লাহর আমানত এবং এ আমানত থেকে ব্যয় করবার যে স্বাধীনতা আমায় দেয়া হয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা প্রয়োগ করাই হচ্ছে আমার কর্তব্য। একদিন আল্লাহ তা'য়ালা আমার কাছ থেকে এ আমানত ফেরত নেবন এবং সেদিন প্রত্যেকটি জিনিসের হিসেব দিতে হবে।

এ ধারণা নিয়ে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বেঁচে থাকে, তার চরিত্র সহজেই অনুমান করা যায়। কুচিন্তা থেকে সে তার মনকে মুক্ত রাখবে, মস্তিষ্ককে দুষ্কৃতির চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, কানকে সংরক্ষণ করবে অসৎ আলোচনা শ্রবণ থেকে, কারোর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া থেকে চোখকে সংরক্ষণ করবে, জিহবাকে সংরক্ষণ করবে অসত্য উচ্চারণ থেকে। হারাম জিনিস দিয়ে পেট ভরার চেয়ে উপবাসী থাকাই হবে তার কাম্য। যুলুম করার জন্য সে কখনো তুলবে না তার হাত। সে কখনো তার পা চালাবে না অন্যায়ের পথে। মাথা কাটা গেলেও সে তার মাথা নত করবে না মিথ্যার সামনে। যুলুম ও অসত্যের পথে সে তার কোন আকাংখা ও প্রয়োজন মিটাবে না। তার ভিতরে হবে সততা ও মহত্ত্বের সমাবেশ। সত্য ও ন্যায়কে সে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অধিকতর প্রিয় মনে করবে এবং তার জন্য সে তার সকল স্বার্থ ও অন্তরের আকাংখা, এমন কি নিজস্ব সত্তাকে পর্যন্ত কুরবান করে দেবে। যুলুম ও অন্যায়কে সে ঘৃণা করবে সবচেয়ে বেশী এবং কোন ক্ষতির আশংকায় অথবা লাভের লোভে তার সমর্থন করতে অগ্রসর হবে না। দুনিয়ার সাফল্যও এ শ্রেণীর লোকই অর্জন করিতে পারে।

যার শির আল্লাহ ছাড়া আর কারুর কাছে অবনত হয় না, যার হাত আল্লাহ ছাড়া আর কারুর সামনে প্রসারিত হয় না, তার চেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী, তার চেয়ে বেশী সম্ভ্রান্ত আর কে হতে পারে ? অপমান কি করে তার কাছে ঘেঁষবে ?

যার দিলে আল্লাহ ছাড়া আর কারুর ভীতি স্থান পায় না, আল্লাহ ছাড়া আর কারুর কাছে সে পুরস্কার ও ইনামের প্রত্যাশা করে না, তার চেয়ে বড় শক্তিমান আর কে ? কোন্ শক্তি তাকে বিচ্যুত করতে পারে সত্য-ন্যায়ের পথ থেকে, কোন্ সম্পদ খরিদ করতে পারে তার ঈমানকে ?

আরাম-পূজারী যে নয়, ইন্দ্রিয়পরতার দাসত্ব যে করে না, বল্গাহারা লোভী জীবন যার নয়, নিজ সৎ পরিশ্রম লব্ধ উপার্জনে যে খুশী, অবৈধ সম্পদের স্তূপ যার সামনে এলে সে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ শান্তি ও সন্তোষ যে লাভ করেছে, দুনিয়ায় তার চেয়ে বড় ধনী, তার চেয়ে বড় সম্পদশালী আর কে ?

যে ব্যক্তি প্রত্যেক মানুষের অধিকার স্বীকার করে নেয়, কাউকে বঞ্চিত করে না তার ন্যায্য অধিকারে; প্রত্যেক মানুষের সাথে যে করে সদাচরণ, অসদাচরণ করে না কারুর সাথে, বরং প্রত্যেকেরই কল্যাণ প্রচেষ্টা যার কাম্য, অথচ তার প্রতিদানে সে কিছু চায় না, তার চেয়ে বড় বন্ধু ও সর্বজন প্রিয় আর কে হতে পারে ? মানুষের মন আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়ে তার দিকে, প্রত্যেকটি মানুষই বাধ্য হয় তাকে সম্মান ও প্রীতি দিয়ে কাছে টেনে নিতে।

তার চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত দুনিয়ায় আর কেউ হতে পারে না, কারণ সে কারুর আমানত বিনষ্ট করে না, ন্যায়ের পথ থেকে মুখ ফিরায় না। প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং আচরণের সততা প্রদর্শন করে, আর কেউ দেখুক আর নাই দেখুক আল্লাহ তো সবকিছুই দেখছেন, এ ধারণা নিয়ে সে সবকিছুই করে যাচ্ছে ঈমানদারীর সাথে। এমন লোকের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কে প্রশ্ন তুলবে, কে তার উপর ভরসা না করবে ?

মুসলিম চরিত্র ভাল করে বুঝতে পারলেই বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, দুনিয়ায় মুসলিম কখনো অপমানিত, বিজিত ও অপরের হুকুমের তাবেদার হয়ে থাকতে পারে না। সবসময়েই সে থাকবে বিজয়ী ও নেতা হয়ে, কারণ ইসলাম তার ভিতর যে গুণের জন্ম দিয়েছে তার উপর কোনো শক্তিই বিজয়ী হতে পারে না।

এমনি করে দুনিয়ায় ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করে যখন সে তার প্রভুর সামনে হাযির হবে, তখন তার উপর বর্ষিত হবে আল্লাহর

অসীম অনুগ্রহ ও রহমাত, কারণ যে আমানত আল্লাহ্ তার নিকট সোপর্দ করেছিলেন, সে তার পরিপূর্ণ হক আদায় করেছে এবং আল্লাহ যে পরীক্ষায় তাকে ফেলেছিলেন, সে কৃতিত্বের সাথে তাতে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। এ হচ্ছে চিরন্তন সাফল্য, যা ধারাবাহিক চলে আসে দুনিয়া থেকে আখেরাতের জীবন পর্যন্ত এবং তার ধারা কখনো হারিয়ে যায় না।

এ হচ্ছে ইসলাম—মানুষের স্বভাবধর্ম। কোন জাতি বা দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় এ বিধান। সকল যুগে সকল জাতির মধ্যে ও সকল দেশে যেসব আল্লাহ পরস্ত ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ অতীত হয়ে গেছেন, তাদের ধর্ম—তাদের আদর্শ ছিলো ইসলাম। তারা ছিলেন মুসলিম—হয়তো তাদের ভাষায় সে ধর্মের নাম ইসলাম অথবা অপর কিছু ছিলো।

ঈমান ও আনুগত্য

আনুগত্যের জন্য জ্ঞান ও প্রত্যয়ের প্রয়োজন

আগের অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, আল্লাহর আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। এখন আমি বলব যে, মানুষ ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করতে পারে না, যতোক্ষণ না সে কতগুলো বিশেষ জ্ঞান লাভ করে এবং সে জ্ঞান প্রত্যয়ের সীমানায় পৌঁছে।

সবার আগে মানুষের প্রয়োজন আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণ প্রত্যয় লাভ। কেননা আল্লাহ আছেন, এ প্রত্যয় যদি তার না থাকলো, তা হলে কি করে সে তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করবে ?

এর সাথে সাথেই প্রয়োজন আল্লাহর গুণরাজী সম্পর্কে জ্ঞান। আল্লাহ এক এবং কর্তৃত্বে তাঁর কোন শরীক নেই, এ কথাই যদি কোন ব্যক্তির জানা না থাকে, তা হলে অপরের কাছে মাথা নত করা ও হাত পাতার বিপদ-সম্ভাবনা থেকে সে ব্যক্তি কি করে বেঁচে থাকতে পারে ? আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, শুনছেন এবং সবকিছুরই খবর রাখছেন, এ সত্য যে ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারছে না, সে নিজেকে আল্লাহর না-ফরমানী থেকে কি করে দূরে রাখবে ? এ কথাগুলো নিয়ে যখন ধীরভাবে চিন্তা করা যায়, তখন বুঝতে পারা যায় যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর গুণরাজি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী না হবে, ততোক্ষণ চিন্তায়, আচরণে ও কর্মে ইসলামের সহজ সরল পথে চলবার জন্য অপরিহার্য গুণরাজি তার ভিতরে সৃষ্টি হোতে পারে না। সেই জ্ঞানও কেবল জানার সীমানার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। বরং তাকে প্রত্যয়ের সাথে মনের মধ্যে দৃঢ় বদ্ধমূল করে নিতে হবে, যেন মানুষের মন তার বিরোধী চিন্তা থেকে এবং তার জীবন তার জ্ঞানের প্রতিকূল কর্ম থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

এরপর মানুষকে আরো জানতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার সঠিক পন্থা কি ? কি কি কাজ আল্লাহ পসন্দ করেন যা সে করবে এবং কোন্ কোন্ জিনিস অপসন্দ করেন ঃ যা থেকে সে দূরে থাকবে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন ও বিধানের সাথে পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য। এ আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসরণ করেই যে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে পূর্ণ প্রত্যয় পোষণ করতে হবে। কেননা গোড়া থেকেই এ জ্ঞান না থাকলে সে আনুগত্য করবে কার ; আর যদি জ্ঞান থাকে, অথচ পূর্ণ প্রত্যয় না থাকে—অথবা মনে এ ধারণা পোষণ করে থাকে

যে, এ আইন ও বিধান ছাড়া আরো কোন আইন ও বিধান নির্ভুল হোতে পারে, তা হলে কি করে সঠিকভাবে সে তার অনুসরণ করতে পারে?

মানুষকে আরো জানতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী পথে চলার ও তাঁর পসন্দ মতো বিধানের আনুগত্য না করার পরিণাম কি? আর তাঁর হুকুম মেনে চলার পুরস্কারই বা কি? এ উদ্দেশ্যে তার আখেরাতের জীবনের, আল্লাহর আদালতে হাযির হওয়ার, না-ফরমানীর শাস্তি লাভের ও আনুগত্যের পুরস্কার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রত্যয় থাকা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবন সম্পর্কে অবগত নয়, তার কাছে আনুগত্য ও না-ফরমানী উভয়ই মনে হয় নিষ্ফল। তার ধারণা, শেষ পর্যন্ত যে ব্যক্তি আনুগত্য করে আর যে ব্যক্তি তা করে না, উভয়ের অবস্থাই এক। কেননা দু'জনই তারা মাটিতে মিশে যাবে, তা হলে কি করে তার কাছে প্রত্যাশা করা যাবে যে, সে আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা ও ক্লেশ বরদাশত করতে রাযী হবে এবং যেসব গুনাহ থেকে এ দুনিয়ায় তার কোন ক্ষতির আশংকা নেই, তা থেকে সে সংযত হয়ে থাকবে? এ ধরনের ধারণা পোষণ করে মানুষ কখনো আল্লাহর আইনের অনুগত হতে পারে না। তেমনি আখেরাতের জীবন ও আল্লাহর আদালতে হাযির হওয়া সম্পর্কে যার জ্ঞান রয়েছে, অথচ প্রত্যয় নেই, এমন লোকের পক্ষে আনুগত্যের ক্ষেত্রে মযবুত হয়ে থাকা সম্ভব নয়। কেননা সন্দেহ ও দ্বিধা নিয়ে মানুষ কোন বিষয়ে দৃঢ় মত হোতে পারে না মানুষ কোন কোন কাজ ঠিক তখনই মন লাগিয়ে করতে পারে, যখন প্রত্যয় জন্মে যে, কাজটি কল্যাণকর। আবার অপর কোন কাজ তারা তখনই বর্জন করার সংকল্প করতে পারে, যখন কাজটি অনিষ্টকর বলে তাদের পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণের জন্য তার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে যেমন জ্ঞান থাকা অপরিহার্য তেমনি সে জ্ঞান প্রত্যয়ের সীমানায় পৌঁছা চাই।

ঈমানের পরিচয়

উপরের বর্ণনায় যে জিনিসকে আমরা জ্ঞান ও প্রত্যয় বলে বিশেষিত করেছি, তারই নাম হচ্ছে ঈমান। ঈমানের অর্থ হচ্ছে জানা এবং মেনে নেয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ব, তাঁর সত্যিকার গুণরাজি, তাঁর কানুন এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে জানে এবং দিলের মধ্যে তৎসম্পর্কে প্রত্যয় পোষণ করে, তাকে বলা হয় মু'মিন এবং ঈমানের ফল হচ্ছে এই যে, তা মানুষকে মুসলিম অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত ও আজ্ঞাবহ করে তোলে।

ঈমানের এ পরিচয় থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, ঈমান ছাড়া কোন মানুষ মুসলিম হোতে পারে না। বীজের সাথে গাছের যে সম্পর্ক, ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্কও ঠিক অনুরূপ। বীজ ছাড়া গাছের জন্মই হোতে

পারে না। অবশ্যি এমন হোতে পারে যে, বীজ যমীনে বপন করা হল, কিন্তু যমীন খারাপ হওয়ার অথবা আবহাওয়া ভালো না হওয়ার কারণে গাছ দুর্বল বা বিকৃত হয়ে জন্মালো। তেমনি কোন ব্যক্তির যদি গোড়া থেকে ঈমানই না থাকলো, তার পক্ষে 'মুসলিম' হওয়া কি করে সম্ভব হবে? অবশ্যি এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব যে, কোন ব্যক্তির দিলের মধ্যে ঈমান রয়েছে ; কিন্তু তার আকাংখার দুর্বলতা অথবা বিকৃত শিক্ষা-দীক্ষা ও অসৎ সর্গের প্রভাবে সে পূর্ণ ও পাকা 'মুসলিম' হোতে পারলো না।

ঈমান ও ইসলামের দিক দিয়ে বিচার করলে গোটা মানব-সমাজকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

এক ঃ যাদের ভিতরে ঈমান রয়েছে এবং তাদের ঈমান তাদেরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পূর্ণ অনুগত করে দেয়। যেসব কাজ আল্লাহ অপসন্দ করেন তা থেকে তারা এমন করে দূরে থাকে, যেমন মানুষ আগুনের স্পর্শ থেকে দূরে থাকে। যা কিছু আল্লাহ পসন্দ করেন তা তারা তেমনি উৎসাহের সাথে করে যায় যেমন করে কোন মানুষ ধন-দৌলত কামাই করবার জন্য উৎসাহ সহকারে কাজ করে যায়। এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মুসলমান।

দুই ঃ যাদের ভিতরে ঈমান রয়েছে, কিন্তু তাদের ঈমান এতটা শক্তিশালী নয় যে, তা তাদেরকে পুরোপুরি আল্লাহর আজ্ঞাবহ করে তুলবে। তারা কিছুটা নিম্নতর পর্যায়ের লোক হলেও অবশ্যি মুসলমান। তারা না-ফরমান হলেও অবশ্যি মুসলমান। তারা না-ফরমানী করলে নিজস্ব অপরাধের মাত্রা হিসাবে শাস্তির যোগ্য হবে, কিন্তু তারা অপরাধী হলেও বিদ্রোহী নয়। কারণ তারা বাদশাহকে বাদশাহ বলে মানে এবং তাঁর আইনকে আইন বলে স্বীকার করে।

তিন ঃ যাদের ঈমান নেই ; কিন্তু প্রকাশ্যে তারা এমন সব কাজ করে, যা আল্লাহর আইন মুতাবিক বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এরা বিদ্রাহী, এদের প্রকাশ্য সৎকর্ম প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তীতা নয়, তাই তার উপর নির্ভর করা চলে না। তাদের তুলনা চলতে পারে সেই শ্রেণীর লোকের সাথে, যারা বাদশাহকে বাদশাহ বলে মানে না, তার আইনকে আইন বলে গণ্য করে না। এ ধরনের লোকের কার্যকলাপ যদি আইন বিরোধী নাও হয়, তথাপি তাদেরকে বাদশাহর বিশ্বস্ত ও তাঁর আইনের অনুসারী বলতে পারা যায় না। তারা অবশ্যি বিদ্রোহীদের মধ্যেই গণ্য হবে।

চার ঃ যাদের ঈমান নেই এবং কর্মের দিক দিয়েও যারা দুর্জন ও দুষ্কৃতিকারী। এরাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্তরের লোক, কেননা এরা যেমন বিদ্রোহী তেমনি বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী।

মানব জাতির এ শ্রেণী বিভাগ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাফল্য নির্ভর করে একমাত্র ঈমানের উপর। ইসলাম-পূর্ণ হোক আর অপূর্ণ হোক—জন্ম নেয় একমাত্র ঈমানের বীজ থেকে। যেখানে ঈমান নেই সেখানে ঈমানের স্থান অধিকার করে কুফুর—আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তা তার তীব্রতা বেশী হোক আর কমই হোক।

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম

আনুগত্যের জন্যে ঈমানের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর গণরাজি ও তাঁর পসন্দ করা আইন ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান এবং যে জ্ঞানের উপর প্রত্যয় পোষণ করা যায়, তা অর্জন করার মাধ্যম কি?

আগেই বলা হয়েছে যে, সকল দিকে ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহর কারিগরির নিদর্শন। সেই সব নিদর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ কারখানা একই কারিগরের সৃষ্টি এবং তিনিই তাকে চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সব নিদর্শনের ভিতরে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় গুণের দীপ্তি। তাঁর হিকমত, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কুদরাত, তাঁর দয়া, তাঁর প্রভুত্ব, তার ক্রোধ—এক কথায় তাঁর এমন কোন গুণ নেই, যা তাঁর কর্মের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত না হয়েছে, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি ও মানবিক যোগ্যতা এ সব জিনিস দেখতে ও বুঝতে গিয়ে বারংবার ভুল করছে। এসব নির্দশন চোখের সামনে মওজুদ রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ বলছে খোদা দু'জন, কেউ বলছে খোদা তিনজন, কেউ অসংখ্য খোদা মানছে; কেউ কেউ আবার আল্লাহর কর্তৃত্বকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করছে। তারা বৃষ্টি, হাওয়া আর আগুনের জন্যে আলাদা আলাদা খোদা মানছে, মোটকথা তাদের বক্তব্য হচ্ছে প্রত্যেকটি শক্তির খোদা আলাদা এবং ঐ সমস্ত খোদার আবার একজন সরদার খোদা আছেন। তাদের অস্তিত্ব ও গুণরাজি উপলব্ধি করতে গিয়ে মানুষের বুদ্ধি বহুবার ধোঁকা খেয়েছে। এখানে তার বিস্তৃত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও মানুষ নানা রকম ভুল ধারণা করে বসে আছে। কেউ বলে মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাবে, তারপর আর কোন জীবন নেই। কেউ বলে মানুষ এ দুনিয়ায় বারবার জন্ম নিতে থাকবে এবং নিজের কাজ-কর্মের শাস্তি অথবা পুরস্কার পেতে থাকবে।

আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করবার জন্য যে আইনের অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য তা নিজের বুদ্ধি দিয়ে নির্ধারণ করা আরো বেশী কঠিন।

"যদি কোন মানুষ সঠিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, তা হলেও বহু বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-গবেষণার পর সে এ সব বিষয় সম্পর্কে একটা বিশেষ সীমানা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কায়েম করতে

পারে। এরূপ অবস্থায় সে পুরোপুরি সত্য উপলব্ধি করছে বলে তার মনে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাবে না। অবশ্যি মানুষকে কোন পথনির্দেশ না দিয়ে ছেড়ে দিলে তাতে তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পুরোপুরি পরীক্ষা হতে পারতো। সেই ক্ষেত্রে যেসব লোক নিজ চেষ্টা ও যোগ্যতা দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের পথে পৌঁছতো তারাই হতো সফল ; আর যারা পৌঁছতো না, তারা হতো ব্যর্থকাম। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহকে এরূপ কঠিন পরীক্ষায় ফেলেননি ! তিনি তাঁর আপন মেহেরবাণীতে মানুষেরই মধ্যে এমন মানুষ পয়দা করেছেন, যাদেরকে তিনি দিয়েছেন নিজের গুণরাজি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান। দুনিয়ায় মানুষ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে তার পদ্ধতিও তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়ে তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অপর মানুষের কাছে এ জ্ঞান পৌঁছে দিতে। এরাই হচ্ছেন আল্লাহর পয়গাম্বর। তাঁদেরকে জ্ঞান দানের জন্য আল্লাহ যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তার নাম হচ্ছে ওহী এবং যে কিতাবে তাঁদেরকে এ জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর কালাম। এখন মানুষ এ সব পয়গাম্বরের পবিত্র জীবনের দিকে দৃষ্টি রেখে এবং তাঁদের উচ্চাংগের শিক্ষা পর্যালোচনা করে তাঁদের প্রতি ঈমান আছে কিনা তাতেই হচ্ছে তার বুদ্ধি ও যোগ্যতার পরীক্ষা। সত্যানুসন্ধানী ও সত্যনিষ্ঠ যারা, সত্যের বাণী ও খাঁটি মানুষের শিক্ষা মেনে নিয়ে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে; আর না মানলে বোঝা যাবে যে, সত্য ও ন্যায়কে উপলব্ধি করে তাকে মেনে নেয়ার যোগ্যতা তাঁদের মধ্যে নেই, এ অস্বীকৃতি তাদেরকে পরীক্ষায় অকৃতকার্য করে দেবে এবং আল্লাহ ও তাঁর আইন এবং আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তারা কখনো কোন সঠিক জ্ঞান হাসিল করতে পারবে না।

ঈমান বিল-গায়েব

কোন বিশেষ জিনিস সম্পর্কে যদি কারো কোন জ্ঞান না থাকে, তখন সে কোন জ্ঞানী লোকের সন্ধান করে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে কাজ করে। অসুস্থ হলে কোন লোক নিজের চিকিৎসা নিজেই করে না, বরং ডাক্তারের কাছে চলে যায়। ডাক্তারের সনদ প্রাপ্ত হওয়া তাঁর অভিজ্ঞতা থাকা, তাঁর হাতে বহু রোগী আরোগ্য হওয়া এবং এমনি আরো বহু খবর জেনে সে ঈমান আনে যে, তার চিকিৎসার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন ডাক্তারের ভিতরে তা মওজুদ রয়েছে। তিনি যেসব ঔষধ যেভাবে ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন, এ ঈমানের উপর নির্ভর করে সে তেমনি করে তা ব্যবহার করে এবং তাঁর নির্দেশিত জিনিসগুলো সে বর্জন করে। এমনি করে আইন কানুনের ব্যাপারে একজন লোক ঈমান আনে উকিলের উপর এবং তারই আনুগত্য করে যায়। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের

উপর ঈমান এনে তাকেই মেনে চলে। কোথাও যাবার সময় রাস্তা জানা না থাকলে তখন কোন জানা-শোনা লোকের উপর ঈমান এনে তার দেখানো পথে চলতে হয়। মোটকথা দুনিয়ার যে কোন কাজে মানুষ নিজের অবগতি ও জ্ঞানের জন্য কোন অভিজ্ঞ লোকের উপর ঈমান আনে এবং তার আনুগত্য করতে বাধ্য হয়। এরই নাম ঈমান বিল-গায়েব।

ঈমান বিল-গায়েব বলতে বুঝায়, যা কিছু মানুষের জানা নেই তা কোন জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে জেনে নিয়ে মানুষ তার উপর প্রত্যয় পোষণ করবে। আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা ও গুণরাজি সম্পর্কে মানুষ কিছুই অবগত নয়। তাঁর ফিরেশতারা তাঁর হুকুম অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন এবং সব দিক দিয়ে মানুষকে ঘিরে রয়েছেন, তাও কেউ জানে না। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার পন্থা কি তার খবরও কারো জানা নেই। আখেরাতের জীবনের সঠিক অবস্থা সকলেরই অজ্ঞাত। এর সবকিছুর জ্ঞান মানুষকে এমন এক লোকের কাছ থেকে হাসিল করতে হবে, যাঁর বিশ্বস্ততা, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা আল্লাহভীতি, পাক-পবিত্র জীবন ও জ্ঞানগর্ব আলোচনা তার মনে বিশ্বাস জন্মাবে যে, তিনি যা বলেন, তা নির্ভুল এবং তার সব কথাই প্রত্যেয়ের যোগ্য, একেই বলে ঈমান বিল-গায়েব। আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার জন্য ঈমান বিল-গায়েব অপরিহার্য, কেননা পয়গাম্বর ব্যতীত অপর কোন মাধ্যম দ্বারা সঠিক জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব এবং সঠিক জ্ঞান ব্যতীত ইসলামের পথে সঠিকভাবে চলাও সম্ভব হবে না।

নবুয়াত

আগের অধ্যায়ে তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে ঃ

প্রথমত, আল্লাহ্ তা'য়ালার আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আল্লাহর সত্তা ও গুণরাজি, তাঁর মনোনীত জীবন পদ্ধতি এবং আখেরাতের সুকৃতির প্রতিদান ও দুষ্কৃতির প্রতিফল সম্পর্কের নির্ভুল জ্ঞান এবং সে জ্ঞানকে এমন পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে নিতে হবে, যেন তার উপর মানুষের পূর্ণ প্রত্যয় বা ঈমান জন্মে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে নিজের চেষ্টায় এ জ্ঞান লাভ করার মতো কঠিন পরীক্ষায় ফেলেননি, তিনি নিজে মানুষেরই মধ্য থেকে তাঁর মনোনিত বান্দাকে (যাদেরকে বলা হয় পয়গাম্বর) ওহীর মাধ্যমে এ জ্ঞান দান করেছেন এবং তাঁদের হুকুম করেছেন অন্যান্য বান্দার কাছে এ জ্ঞান পৌঁছে দিতে।

তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের উপর কেবল মাত্র এতটুকু দায়িত্বই রয়েছে যে, সে আল্লাহর সত্যিকার পয়গাম্বর চিনে নেবে। অমুক ব্যক্তি সত্যি সত্যি আল্লাহর পয়গাম্বর, এ সত্য জানা হলেই তার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর প্রদত্ত যে কোন শিক্ষার উপর ঈমান আনা, তাঁর যে কোন নির্দেশ মেনে এবং তাঁরই অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে চলা।

এখন সবার আগে বলবো পয়গাম্বরীর মূলতত্ত্ব এবং পয়গাম্বরকে চিনবার উপায়ই বা কি?

পয়গাম্বরীর মূলতত্ত্ব

দুনিয়ায় মানুষের যেসব জিনিসের প্রয়োজন, আল্লাহ নিজেই তার সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শিশুর যখন জন্ম হচ্ছে, তখন কত জিনিস তার সাথে দিয়ে তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হচ্ছে তার হিসেব নেই। দেখবার জন্য চোখ, শুনবার জন্য কান, ঘ্রাণ ও শ্বাস টানবার জন্য নাক, অনুভব করবার জন্য সারা গায়ের চামড়ায় স্পর্শ অনুভূতি, চলবার জন্য পা, কাজ করার জন্য হাত, চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্ক এবং আগে থেকেই সবরকম প্রয়োজনের হিসেব করে আরো বেশুমার জিনিস যুক্ত করে দেয়া হয়েছে তার ছোট্ট দেহটির সাথে। আবার দুনিয়ায় পা রেখেই সে দেখতে পায় জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় এত সব সরঞ্জাম—যার হিসেব করে শেষ করা সম্ভব নয়। হাওয়া আছে, আলো আছে, পানি আছে, যমীন আছে, আগে থেকেই মায়ের বুকে সঞ্চিত হয়ে আছে দুধের ধারা, মা-বাপ আপনজন—এমন কি, অপরের অন্তরেও তার জন্য

সঞ্চারিত করে দেয়া হয়েছে স্নেহ, ভালোবাসা ও সহানুভূতি—যা দিয়ে সে প্রতিপালিত হচ্ছে। যতই সে বড় হতে থাকে, ততই তার প্রয়োজন মিটাবার জন্যে প্রত্যেক রকমের জিনিসই মিলতে থাকে, যেন যমীন ও আসমানের সকল শক্তি তারই প্রতিপালন ও খেদমতের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এরপর আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক। দুনিয়ার কাজ-কারবার চালিয়ে নেয়ার জন্য যেসব যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তার সবকিছুই দেয়া হয়েছে মানুষকে। দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি, উপলব্ধি, প্রকাশ-ক্ষমতা এবং এমনি আরো কত রকম যোগ্যতা কম বেশী করে মওজুদ রয়েছে মানুষের মধ্যে। কিন্তু এখানে পাওয়া যায় আল্লাহ তা'য়ালার এক এক বিচিত্র ব্যবস্থাপনার পরিচয়। সকল মানুষকে তিনি ঠিক একই ধরনের যোগ্যতা দান করেননি। তাই যদি হত তা হলে কেউ কারুর মুখাপেক্ষী হত না, কেউ কারুর একবিন্দু পরোয়া করতো না। এর জন্য আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষেরই মধ্যে সব রকম যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন বটে; তার ধরনটা হচ্ছে এই যে, কোন এক ব্যক্তিকে যেমন এক যোগ্যতা বেশী করে দেয়া হয়েছে, তেমনি অপরকে দেয়া হয়েছে আর কোন যোগ্যতা। কেউ অপর লোকের চেয়ে শারীরিক পরিশ্রমের শক্তি বেশী করে নিয়ে আসে। কোন কোন লোক আবার বিশেষ বিশেষ শিল্পকলা বা বৃত্তির জন্মগত অধিকারী হয়, যা অপরের মধ্যে দেখা যায় না। কোন কোন লোকের মধ্যে প্রতিভা ও বুদ্ধি-বৃত্তিক শক্তি থাকে অপরের চাইতে বেশী। জন্মগত গুণের দিক দিয়ে কেউ হয় সিপাহসালার, কারুর মধ্যে থাকে নেতৃত্বের বিশেষ যোগ্যতা। কেউ জন্মে অসাধারণ বাগ্মিতার শক্তি নিয়ে, আবার কেউ স্বাভাবিক রচনাশৈলীর অধিকারী। এমনও কোন কোন লোক জন্মে, যার মস্তিক সবচাইতে বেশী ধাবিত হয় গণিত-শাস্ত্রের দিকে এবং অপরের বুদ্ধি যার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না, এমনি সব জটিল প্রশ্নের সমাধান সে করে দেয় অনায়াসে। আবার কোন ব্যক্তি জন্মে বহু বিচিত্র নিত্য নতুন জিনিস উদ্ভাবনের শক্তি নিয়ে, যার উদ্ভাবনী শক্তি দেখে দুনিয়া তাকিয়ে থাকে তার দিকে অবাক বিস্ময়ে। কোন কোন ব্যক্তি এমন অতুলনীয় আইন জ্ঞান নিয়ে আসে যে, যেসব আইনের জটিল তথ্য উৎঘাটন করার জন্য বছরের পর বছর চেষ্টা করেও অপরের কাছে তা বোধগম্য হয় না, তার দৃষ্টি আপনা থেকেই সেখানে পৌঁছে যায়। এ হচ্ছে আল্লাহর দান। কোন মানুষ নিজের চেষ্টায় আপনার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারে না। শিক্ষা-দীক্ষার মারফতেও ঐসব জিনিস তৈরী হয় না। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে জন্মগত যোগ্যতা এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিজস্ব জ্ঞান বলে যাকে ইচ্ছা এ যোগ্যতা দান করে থাকেন।

আল্লাহর এ দান সম্পর্কেও চিন্তা করলে দেখা যাবে মানবীয় সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যেসব যোগ্যতার প্রয়োজন বেশী হয়, মানুষের মধ্যে তা বেশী করেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, আবার যার প্রয়োজন যতটা কম মানুষের মধ্যে তা ততোটা কমই সৃষ্টি হয়। সাধারণ সিপাহী দুনিয়ায় বহু জন্মে। চাষী, কুম্ভকার, কর্মকার এবং এমনি আরো নানা রকম কাজের লোক জন্মে অসংখ্য কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, রাজনীতি ও সিপাহসালারীর যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ জন্মে কম। কোন বিশেষ কর্মে অসাধারণ যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রতিভার অধিকারী লোকেরা আরো কম জন্মে থাকেন, কেননা তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে তাঁদের মত সুদক্ষ ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজনের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

এখন বিবেচনা করতে হবে যে, মানুষের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার, গণিতশাস্ত্রবিদ, বিজ্ঞানী, আইন বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিশারদ, অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য বিভিন্ন দিকের যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ জন্ম নিলেই তা মানুষের পার্থিব জীবনের সাফল্য বিধানের জন্য যথেষ্ট নয়। এদের সবার চেয়ে বৃহত্তর আর এক শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন রয়েছে, যারা মানুষকে আল্লাহর সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। অন্যান্য লোকেরা তো কেবল জানতে পারে, দুনিয়ার মানুষের জন্য কি কি রয়েছে, আর কি কি পন্থায় তা ব্যবহার করা যেত পারে; কিন্তু এ কথা বলার লোকেরও তো প্রয়োজন আছে যে, মানুষ নিজে কিসের জন্য সৃষ্টি হলো ? দুনিয়ার সব জিনিস-পত্র মানুষকে কে দিয়েছেন ? এবং সেই দাতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কি ? কেননা মানুষ দুনিয়ায় তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করেই নিশ্চিত ও চিরন্তন সাফল্য অর্জন করতে পারে। এ হচ্ছে মানুষের প্রকৃত ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। মানুষের জ্ঞান এ কথা মেনে নিতে রাযী হতে পারে না যে, যে আল্লাহ আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজন মিটাবার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তিনি আমাদের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন না মিটিয়ে থাকবেন। না কিছুতেই তা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা যেমন করে বিশেষ বিশেষ শিল্পকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করেছেন তেমনি করে এমন মানুষও তিনি সৃষ্টি করেছেন, যাঁদের মধ্যে আল্লাহকে চিনবার উচ্চতম যোগ্যতা ছিল। নিজের কাজ থেকে তিনি তাঁদেরকে দিয়েছেন আল্লাহর বিধান (দ্বীন), আচরণ (আখলাক) ও জীবন যাপন পদ্ধতি (শরীয়াত) সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অপর মানুষকে এসব বিষয়ের শিক্ষা দেয়ার কাজে তাঁদেরকে নিযুক্ত করেছেন। আমাদের ভাষায় এ সব মানুষকেই বলা হয় নবী, রাসূল অথবা পয়গাম্বর।

পয়গাম্বরের পরিচয়

অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ যেমন বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রতিভা ও স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে জন্ম লাভ করেন, তেমনি করে পয়গাম্বরও এক বিশেষ ধরনের স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে আসেন।

এক জন্মগত প্রতিভার অধিকারী কবির বাণী শুনেই আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি এক বিশেষ যোগ্যতার অধিকার নিয়ে জন্মেছেন, কারণ অপর কোন কোন ব্যক্তি বহু চেষ্টা করেও তেমন কবিতা শুনাতে পারেন না। এমনি করে জন্মগত প্রতিভার অধিকারী বক্তা, সাহিত্যিক, আবিষ্কর্তা, নেতা—সবারই সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের নিজ নিজ কর্মসূচীর ভিতর দিয়ে, কারণ তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে এমন অসাধারণ যোগ্যতা প্রকাশ করেন, যা অপরের মধ্যে দেখা যায় না। পয়গাম্বরের অবস্থাও তাই। তাঁর মন এমন সব সমস্যার চিন্তা করতে সক্ষম হয়, অপরের মন যার কাছে ঘেষতেও পারে না। তিনি এমন সব কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে পারেন, যা অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। বহু বছরের চিন্তা ও গবেষণার পরও অপরের নযর যেসব সূক্ষ্ম বিষয়ের গভীরে পৌছতে পারে না, তাঁর নযর আপনা থেকেই সেখানে পৌছে যায়। তিনি যা কিছু বলেন, আমাদের যুক্তি তা মেনে নেয়, আমাদের অন্তর তার সত্যতা উপলব্ধি করে দুনিয়ার অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সৃষ্টির সীমাহীন অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় তার এক একটি বাণীর সত্যতা। অবশ্যি আমরা নিজেরা তেমনি কোন কথা বলতে চেষ্টা করলেও তাতে আমাদের ব্যর্থতা নিশ্চিত। তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি এমন নিষ্কলুষ ও পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি সত্য, সহজ-সরল ও মহত্বপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেন। কখনো তিনি কোন অসত্য উক্তি করেন না, কোন অসৎ কাজ করেন না। তিনি হামেশা পুণ্য ও সৎ কর্মের শিক্ষাদান করেন এবং অপরকে যা কিছু উপদেশ দেন, নিজে তার কার্যে পরিণত করে দেখান। তিনি যা বলেন, তার বিপরীত কাজ নিজে করেন, এমন কোন দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর কথায় ও কাজে কোন স্বার্থের স্পর্শ থাকে না, অপরের মংগলের জন্য তিনি নিজে ক্ষতি স্বীকার করেন; কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য অপরের ক্ষতি সাধন করেন না। তাঁর সারা জীবন হয়ে উঠে সত্য-ন্যায়, মহত্ব, পবিত্রতা, উচ্চ-চিন্তা ও উচ্চাংগের মানবতার আদর্শ এবং বিশেষ অনুসন্ধান করেও তার ভিতরে পাওয়া যায় না কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি। এ ব্যক্তি যে আল্লাহর খাঁটি পয়গাম্বর, তা তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য থেকেই পরিষ্কার চিনে নেয়া যায়।

পয়গাম্বরের আনুগত্য

কোন বিশেষ ব্যক্তিকে যখনই আল্লাহর খাঁটি পয়গাম্বর বলে চিনে নেয়া যায়, তখন তাঁর কথা মেনে নেয়া তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন ব্যক্তিকে পয়গাম্বর বলে স্বীকার করা হবে অথচ তাঁর হুকুম মানা হবে না এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তি বিরোধী। ব্যক্তি বিশেষকে পয়গাম্বর বলে স্বীকার করে নেয়ার মানে, এ কথা মেনে নেয়া

যে, তিনি যা কিছু বলেছেন আল্লাহর তরফ থেকে বলেছেন ; যা কিছু করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী করছেন। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হবে, যা কিছু করা হবে, তা হবে আল্লাহরই বিরুদ্ধে। আর যা কিছু আল্লাহর বিরোধী, তা কখনো সত্য হতে পারে না। এ কারণেই কোন ব্যক্তিকে পয়গাম্বর বলে মেনে নেয়ার পর তাঁর কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া স্বতঃই অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাঁর কথার যৌক্তিকতা ও কল্যাণ বোধগম্য হোক অথবা না-ই হোক, তাঁর আদেশ-নিষেধের কাছে মস্তক অবনত করতেই হবে। পয়গাম্বরের কাছ থেকে যে বাণী আসবে, তাকে কেবলমাত্র পয়গাম্বরের বাণী হবার কারণেই সত্য, জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত বলে মেনে নিতে হবে। তাঁর কোন নির্দেশের যৌক্তিকতা কারো হৃদয়ংগম না হলেও তার অর্থ এই নয় যে, তার ভিতরে কোন ক্রটি রয়েছে, বরং তার অর্থ হচ্ছে এই যে, তাঁর উপলব্ধির মধ্যে কিছু না কিছু ভুল রয়েছে।

এটা সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ শিল্পকলা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত না হলে তার সর্বপ্রকার সূক্ষ্মতা তার কাছে ধরা পড়ে না, কিন্তু কোন বিশেষজ্ঞের কথা তার বোধগম্য হচ্ছে না, নিছক এ যুক্তিতে তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলে সে কত বড় নির্বোধ বলে প্রমাণিত হবে। দুনিয়ার যে কোন কাজে প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞের, বিশেষজ্ঞকে স্বীকার করে নেয়ার পর তার ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে হয়, তার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা চলে না, কারণ সকল লোক সকল কাজে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না। কোন লোকই দুনিয়ার সব জিনিস সমভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। যে কোন উদ্দেশ্যে পূর্ণ জ্ঞান ও সতর্কতা সহকারে একজন বিশেষজ্ঞের সন্ধান করতে হবে এবং যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলে পূর্ণ প্রতীতি জন্মাবে তখন তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়াই হবে একমাত্র কর্তব্য। তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করা এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথার 'আগে আমায় বুঝিয়ে দাও,নইলে মানব না' বলতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং সোজাসুজি নির্বোধেরই কাজ। কোন উকিলের উপর মুকদ্দমার ভার ন্যস্ত করার পর এ ধরনের গোলযোগ করতে গেলে তিনি তাকে তাঁর দফতর থেকে বের করে দেবেন। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়ে তাঁর প্রত্যকটি নির্দেশের সপক্ষে দলীল-প্রমাণ দাবী করলে তিনি চিকিৎসাই ছেড়ে দিবেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন সকলের রয়েছে। সকলেই জানতে চায় আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী জীবন যাপন করা যায় কোন্ পদ্ধতিতে। অথচ কারো নিজের তা জানবার কোন সঠিক উপায় নেই। এখন প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর কোন সত্যিকার পয়গাম্বরের সন্ধান করা। এ সন্ধানের কাজে বিশেষ সতর্কতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি

সহকারে অগ্রসর হতে হবে। কারণ খাঁটি পয়গাম্বর ছাড়া অপর কোন লোককে পয়গাম্বর বলে স্বীকার করে নিলে স্বাভাবিকভাবেই সে ভুল পথে চালিত করবে ; কিন্তু বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্মাবে যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার সত্যিকার পয়গাম্বর, তখন তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা এবং তাঁর প্রত্যেকটি হুকুমের আনুগত্য করা সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমানের আবশ্যকতা

যখন জানা গেল যে, আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর পয়গাম্বর যে পথের নির্দেশ দেন তাই হচ্ছে ইসলামের সঠিক ও সরল পথ, তখন স্বতঃই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, পয়গাম্বরের প্রতি ঈমান আনা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি পয়গাম্বরের প্রদর্শিত পথ বর্জন করে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী অন্যবিধ পথ উদ্ভাবন করে সে নিশ্চিতরূপে বিভ্রান্ত।

এ ব্যাপারে মানুষ বহু বিচিত্র ভুলের পথ ধরে চলে। এক শ্রেণীর লোক পয়গাম্বরের সত্যতা স্বীকার করে; কিন্তু তাঁর উপর যেমন ঈমান পোষণ করে না, তেমনি তাঁর হুকুমের আনুগত্য করে না। এরা কেবল কাফের নয়, নির্বোধও বটে; কারণ পয়গাম্বরকে সত্যিকার পয়গাম্বর বলে স্বীকার করার পর তাঁর নির্দেশ মেনে না চলার অর্থ হচ্ছে জেনে বুঝে মিথ্যার আনুগত্য করা। এর চাইতে বড় আর কোন নির্বুদ্ধিতা যে হতে পারে না, এটা সুস্পষ্ট সত্য।

কেউ কেউ আবার বলে ঃ পয়গাম্বরের আনুগত্য করার প্রয়োজন আমাদের নেই। নিজেদের বুদ্ধি দিয়েই আমরা সত্যের পথ জেনে নিতে পারব। এও এক মারাত্মক ভুলের পথ। গণিতশাস্ত্র পাঠ করে নিশ্চিত জানা যায় যে, এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত মাত্র একটি সরল রেখাই টানা যেতে পারে। তাছাড়া আর যতো রেখাই টানা যাক, তা হয়তো বাঁকা হবে, নইলে অপর বিন্দু পর্যন্ত পৌছবে না। সত্যের পথ যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'সিরাতে মুসতাকীম' (সরল-সঠিক পথ) বলা হয়, তার বেলায়ও সেই একই নীতি প্রযোজ্য। এ পথ মানুষ থেকে শুরু হয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে এবং গণিতের উপরিউক্ত সূত্র অনুযায়ী তা একটিই হতে পারে। এ ছাড়া আর যেসব পথ রয়েছে, তা হয় বাঁকা, নইলে তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছবে না। কাজেই যে পথ সহজ-সরল, পয়গাম্বর তার নির্দেশ দিয়েছেন, তাছাড়া আর কোন রাস্তাই 'সিরাতে মুসতাকীম' হতে পারে না। পয়গাম্বরের নির্দেশিত পথ ত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিজে কোন পথ খুঁজে বেড়ায়, তাকে দু'টি বিকল্প পরিণতির যে কোন একটির সম্মুখীন হতে হবে। হয় তার আল্লাহ পর্যন্ত পৌছবার কোন পথ মিলবে না,

অথবা মিললেও তা হবে আকাবাঁকা দীর্ঘ পথ। সরল রেখার পরিবর্তে তা হবে বক্র রেখা। প্রথম পরিণতির দিক দিয়ে তো তার ধ্বংসই অনিবার্য, দ্বিতীয় পরিণতির দিক দিয়েও তার নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত হবার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কোন নির্বোধ ও জ্ঞানহীন জানোয়ারও এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার জন্য বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে চলতে থাকে। এক্ষেত্রে আল্লাহর কোন নেক বান্দাহ যাকে সোজা পথের নির্দেশ দিয়েছেন, সে যদি তাঁকে বলতে তাকে "না, আমি তোমার দেখানো পথে চলবো না, নিজে বাঁকা পথে হোঁচট খেয়ে খেয়ে আমার গন্তব্য লক্ষ্যের সন্ধান করে নেবো তাহলে তাকে কি বলা যায় ?"

যে কোন ব্যক্তি এ সাধারণ ভুলটি এক নযরে বুঝে নিতে পারে, কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখলে আরো বুঝতে পারা যায়, যে ব্যক্তি পয়গাম্বরের উপর ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তার জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের বাঁকা বা সোজা কোন পথই মিলতে পারে না। তার কারণ, যে খাঁটি ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তার মস্তিষ্কে নিশ্চিতরূপে এমন কোন বিকৃতি রয়েছে, যার প্রভাবে সে সত্য পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছে। তার উপলব্ধিতে কোন ত্রুটি থাকতে পারে, অথবা তার স্বভাব কোন সত্য ও সৎ বস্তুকে স্বীকার করে নিতে অনিচ্ছুক হওয়ার মতো বিকৃতি সম্পন্ন। হতে পারে সে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত এবং রীতি হিসেবে যা আগে থেকে চলে এসেছে তার কোন বিরূপ সমালোচনা শুনতে সে রাযী নয়, অথবা সে হয়ে আছে আপন প্রবৃত্তির দাস এবং পয়গাম্বরের শিক্ষা মেনে নিতে সে অস্বীকার করেছে এজন্য যে, তা মেনে নেয়ার পর তার আর কোন পাপাচরণ ও অবৈধ কার্য-কলাপের স্বাধীনতা থাকবে না। এ কারণগুলো এমন যে, এর যে কোন একটি কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে থাকলে তার পক্ষে আল্লাহর পথ খুঁজে পাওয়া হয় অসম্ভব। আবার এর কোন কারণ কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে না তাকলেও এটা অসম্ভব যে, একজন সত্যানুসারী, নির্দোষ ও সৎলোক একজন সত্যিকার পয়গাম্বরের শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পয়গাম্বর আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত এবং আল্লাহই তাঁর ওপর ঈমান আনার ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি পয়গাম্বরের প্রতি ঈমান পোষণ করে না সে আল্লাহরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে। একজন লোক যে বাদশার প্রজা, তাঁর পক্ষ থেকে যাকেই শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হোক, তার আনুগত্য করতে সে বাধ্য। বাদশার নিযুক্ত শাসনকর্তাকে সে অমান্য করলে তার অর্থ হবে বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শাসন কর্তৃপক্ষকে মেনে নেয়া আর তার নিযুক্ত শাসনকর্তাকে না মানা সম্পূর্ণ

পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত পয়গাম্বরের ক্ষেত্রেও এ একই নীতি প্রযোজ্য আল্লাহ সকল মানুষের সত্যিকার বাদশাহ। মানুষের পথনির্দেশের জন্য তিনি যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন এবং যার আনুগত্য স্বীকার করতে তিনি মানুষকে হুকুম দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের ফরয তাকে পয়গাম্বর বলে স্বীকার করা ও অপর সবকিছুর আনুগত্য ছেড়ে কেবলমাত্র তাঁরই পথ অনুসরণ করা। তাঁর অনুসরণ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে নিশ্চিতরূপে কাফের। সে আল্লাহকে মানুক অথবা নাই মানুক, তাতে কিছুই আসে যায় না।

পয়গাম্বরীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মানব জাতির মধ্যে কি করে পয়গাম্বরীর ধারা শুরু হয়েছে এবং কি করে ক্রমে ক্রমে উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বরের মাধ্যমে সে ধারার সমাপ্তি ঘটেছে, এখন সেই কথাই বলছি।

এ কথা জানা গেছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা সবার আগে তৈরী করেছিলেন একটি মাত্র মানুষ এবং সেই মানুষটি থেকেই তৈরী করেছিলেন তার সংগিনীকে। তারপর কত শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে। সেই আদি মানুষের বংশধররা ছেয়ে ফেলেছে সারা দুনিয়ার বুক। দুনিয়ায় আজ যতো মানুষ রয়েছে সবই আল্লাহর প্রথম সৃষ্ট এক জোড়া মানুষের সন্তান। সকল জাতির ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিবরণ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানব জাতির শুরু হয়েছিল একটি মাত্র মানুষ থেকে। মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা মানুষ তৈরী হয়েছিল, বরং অধিকাংশ বিজ্ঞানী অনুমান করেন যে, দুনিয়ায় সবার আগে একটি মাত্র মানুষই পয়দা হয়েছিলেন এবং আজকের দুনিয়ার যেখানে যতো মানুষই দেখা যাচ্ছে তারা সবাই এ একটি মাত্র মানুষেরই বংশধর।

আমাদের ভাষায় দুনিয়ার এ প্রথম মানুষকে বলা হয় আদম। আদম থেকেই হয়েছে আদমী শব্দের উৎপত্তি এবং এ শব্দটি হচ্ছে ইনসান বা মানুষের সমার্থক ! আল্লাহ তা'য়ালা সবার আগে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর পয়গাম্বর এবং তাঁকে তাঁর সন্তান সন্তুতিকে ইসলামের শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাদেরকে বলে দেন ঃ তোমাদের ও সারা দুনিয়ার আল্লাহ এক, তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর, তাঁরই কাছে মাথা নত কর, তাঁরই কাছে সাহায্য ভিক্ষা কর, তাঁরই ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী দুনিয়ার বুকে সততা ও ইনসাফের সাথে জীবন যাপন কর। এমনি করে জীবন যাপন করলে তোমরা পাবে বাঞ্ছিত পুরস্কার এবং তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাদের প্রাপ্য হবে কঠিনতম শাস্তি।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে যারা ছিলেন সৎলোক, তারা পিতার নির্দেশিত সহজ পথ অনুসরণ করে চলতে লাগলেন ; কিন্তু অসৎ লোকেরা সে পথ ছেড়ে চলে গেল। ধীরে ধীরে সব রকম দুষ্কৃতির সৃষ্টি হল, কেউ শুরু করলো চন্দ্র, সূর্য ও তারকার পূজা, কেউ আবার শুরু করলো গাছপালা, জীব-জানোয়ার ও নদী-পর্বতের উপাসনা। কেউ কেউ মনে করলো হাওয়া, পানি, আগুন, ব্যাধি, সুস্থতা ও শক্তি এবং প্রকৃতির অন্যান্য কল্যাণকর উপকরণ ও শক্তির খোদা আলাদা আলাদা এবং তাদের প্রত্যেকেরই পূজা করা প্রয়োজন, যাতে প্রত্যেক খোদা-ই খুশী হয়ে তাদের প্রতি মেহেরবান হয়। এমনি করে মূর্খতার কারণে শির্‌ক (অংশীবাদ) ও বুতপরস্তির (পৌত্তলিকতা) নানা রূপ সৃষ্টি হলো এবং তার মাধ্যমে অসংখ্য ধর্মের উদ্ভব হলো। এ হচ্ছে সেই যুগের কথা যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের বংশধররা দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছিল সারা দুনিয়ার বুকে। প্রত্যেক জাতি একটি নতুন ধর্ম তৈরী করে নিয়েছে এবং প্রত্যেকের রীতি-নীতি হয়ে গিয়েছিল স্বতন্ত্র। হযরত আদম (আ) যে বিধান পেশ করেছিলেন তাঁর বংশধরদের কাছে, আল্লাহকে ভুলার সাথে সাথে মানুষ সেই বিধানকেও গেল ভুলে। মানুষ তখন শুরু করেছে তার প্রবৃত্তির দাসত্ব। সব রকম অন্যায় রীতি-নীতি জন্ম লাভ করেছে এবং সব রকম জাহেলী ধারণা প্রসার লাভ করেছে চারদিকে। ভাল-মন্দ বিবেচনায় মানুষ করছে ভুল। বহু অন্যায়কে তারা ভাল মনে করেছে, আর বহু ভাল কাজকে মনে করেছে খারাপ।

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক জাতির মধ্যে পাঠাতে শুরু করলেন তাঁর পয়গাম্বর। প্রথমে হযরত আদম (আ) মানুষকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, অন্যান্য পয়গাম্বরও মানুষকে সেই শিক্ষাই দিতে লাগলেন। নিজ নিজ জাতিকে তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন তাদের ভুলে যাওয়া শিক্ষা। মানুষকে তাঁরা শিখালেন এক আল্লাহর ইবাদাত, তাদেরকে ফিরালেন শির্‌ক ও বুতপরস্তির পথ থেকে। জাহেলী রীতি ভেঙ্গে দিয়ে তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী জীবন অতিবাহনের পথনির্দেশ করলেন এবং নির্ভুল বিধান বিশ্লেষণ করে তাদেরকে চালিত করলেন তাঁর আনুগত্যের পথে। হিন্দুস্তান, চীন, ইরান, ইরাক, মিসর, আফ্রিকা ও ইউরোপ—সোজা কথায় দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই, যেখানে আল্লাহর তরফ থেকে কোন পয়গাম্বর আসেননি। তাঁদের সবারই ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন যাকে আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় বলি ইসলাম[১] অবশ্যি তাঁদের

১. সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে এ ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, ইসলামের শুরু হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ (সা) থেকে। এমন কি, হযরত (সা)-কে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা পর্যন্ত বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে

শিক্ষা-পদ্ধতি ও জীবন-বিধান কিছুটা বিভিন্ন ধরনের ছিল। প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে ধরনের জাহেলীয়াত প্রসার লাভ করেছিল, তা দূর করার উপরই বেশী করে জোর দেয়া হয়েছিল। যে ধরনের ভুল ধারণা যতোটা প্রচলিত হয়েছিল, তার প্রতিকারের জন্য ততোটা বেশী করে মনোযোগ দেয়া প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, তখন তাদের জন্য সহজ শিক্ষা ও সহজ বিধান দেয়া হয়েছিল। ধাপে ধাপে তারা যখন উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে লাগল, তাদের জন্য শিক্ষা ও অনুসরণীয় বিধানেরও ততো বেশী করে প্রসার হতে লাগল। শিক্ষা ও বিধানের এ বিভিন্নতা কেবল বাইরের রূপেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সবারই প্রাণবস্তু ছিল এক অর্থাৎ বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাওহীদ, কর্মে সততা ও সুশৃঙ্খলা এবং আখেরাতের প্রতিফল ও শাস্তির প্রতি প্রত্যয়ের বুনিয়াদই তার প্রাণ-বস্তু।

পয়গাম্বরের প্রতিও মানুষ করেছে বহু অদ্ভুত আচরণ। মানুষ প্রথমে তাঁদের সাথে করেছে দুর্ব্যবহার, তাঁদের উপদেশ অগ্রাহ্য করেছে, কাউকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কাউকে বা হত্যা করেছে। সারা জীবন মানুষের কাছে শিক্ষা প্রচার করে কারুর আবার বহু কষ্টে দশ পাঁচ জন অনুগামী জুটেছে। কিন্তু আল্লাহর এ মনোনীত বান্দাগণ বরাবর তাঁদের কর্তব্য করে গেছেন অবিচলিত ভাবে। অবশেষে তাঁদের শিক্ষা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বড় বড় কওম তাঁদের আনুগত্য স্বীকার করেছে। এরপর মানুষের ভ্রান্তি প্রবণতা (গুমরাহী) আবার নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। পয়গাম্বরদের ওফাতের পর তাঁদের উম্মাতরা ভুলে গেল তাঁদের শিক্ষা। তাঁদের কিতাবে নিজেদের তরফ থেকে সব রকম ধারণা মিশ্রিত করে দিল। ইবাদাতের নতুন নতুন রূপ অবলম্বন করল—কোন কোন শ্রেণী খোদ পয়গাম্বরদেরই উপাসনা শুরু করে দিল। কেউ তার পয়গাম্বরকে বলতে লাগল আল্লাহর অবতার (অর্থাৎ আল্লাহ্ নিজেই মানব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন,) কেউ তার পয়গাম্বরকে বানিয়ে নিল আল্লাহর সাথে শরীক। মোটকথা, মানুষ এমন স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করল যে, যারা মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন, সেই পয়গাম্বরগণকেই তারা পরিণত করলো মূর্তিতে। পয়গাম্বর তাঁর উম্মাতদের যে জীবন বিধান (শরীয়াত) দিয়ে গিয়েছিলেন, ধীরে ধীরে তাকেও তারা বিকৃত করে ফেলল। তার মধ্যে তারা সব রকম মূর্খতা-প্রসূত রীতি মিশিয়ে ফেলল, কতো কাহিনী ও মিথ্যা বর্ণনার সংমিশ্রণ করল এবং মানুষের তৈরী বিধানসমূহকে পয়গাম্বরের প্রদর্শিত বিধানের সাথে চালু করে

এটি অত্যন্ত গুরুতর ভুল ধারণা এবং শিক্ষার্থীদের মন থেকে এ ভুল ধারণা চূড়ান্তভাবে নিরসন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের একথা ভাল করে জানা দরকার যে, ইসলাম সর্বকালের জন্য মানবজাতির এক অভিন্ন ধর্ম হয়ে রয়েছে এবং দুনিয়ার যেখানে যখন আল্লাহর কোন পয়গাম্বর এসেছেন ; এ এক ধর্ম নিয়েই এসেছেন।

দিল। ফলে পয়গাম্বরদের প্রকৃত শিক্ষা ও বিধান কি ছিল এবং পরবর্তী লোকেরা তার সাথে কি কি মিশ্রিত করে তাকে বিকৃত রূপ দিয়েছে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে তা বুঝবার আর কোন উপায় থাকলো না।[১] পয়গাম্বরদের নিজেদের জীবন-কাহিনী মিথ্যা ও অলীক বর্ণনা দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে যে, তাঁদের জীবনের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে না। তথাপি পয়গাম্বরদের জীবন সাধনার সবটুকুই ব্যর্থ হয়ে যায়নি। সর্বপ্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন সত্ত্বেও সকল জাতির মধ্যে আজো কিছু না কিছু সত্য বেঁচে রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্ব ও আখেরাতের ধারণা কোন না কোন রূপে সকল জাতির মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। সততা, সত্য ও নৈতিক জীবনের কোন কোন নীতি সাধারণভাবে সারা দুনিয়ায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ সংগে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির পয়গাম্বরগণ আলাদা আলাদা করে এক এক জাতিকে একটা নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত এমনভাবে তৈরী করে দিয়েছেন, যাতে নির্বিশেষে সকল মানব জাতির কাছে গৃহিত হওয়ার মতো এক সাধারণ ধর্মের শিক্ষা দুনিয়ার মানুষের কাছে পেশ করা যেতে পারে।

আগেই বলেছি, গোড়ার দিকে প্রত্যেক জাতির মধ্যে আলাদা আলাদা পয়গাম্বর এসেছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের শিক্ষা তাঁর নিজ কওমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর কারণ, তখনকার দিনে সকল কওমই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। তাদের মধ্যে বড় বেশী মেলামেশা ছিল না। বস্তুত প্রত্যেক কওম নিজ নিজ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমনি অবস্থায় সকল কওমের জন্য এক সাধারণ যৌথ শিক্ষা প্রচার অত্যন্ত দুরূহ ছিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন কওমের অবস্থা পরস্পর থেকে ছিল স্বতন্ত্র। তখনকার দিনে জাহেলী ধারণার প্রসার হয়েছিল অত্যধিক। এর ফলে নীতিবোধ ও আচরণের যে বিকৃত রূপ দেখা দিয়েছিল, প্রত্যেক জায়গায়ই তার ধরন ছিল স্বতন্ত্র। এর জন্যই আল্লাহর পয়গাম্বরদের জন্য অপরিহার্য ছিল প্রত্যেক কওমের মধ্যেই আলাদা আলাদা শিক্ষা ও হেদায়াত পেশ করার, ধীরে ধীরে বিভ্রান্তিকর ধারণার উচ্ছেদ করে সঠিক ধারণা প্রচারের, ক্রমে ক্রমে জাহেলী জীবন পদ্ধতির বিনাশ সাধন করে শ্রেষ্ঠতম বিধানের আনুগত্য শিক্ষা দেয়ার এবং শিশুদেরকে যেভাবে শিক্ষিত করে তোলা হয়, তেমনি করে শিক্ষা দেয়ার। এমনি করে দুনিয়ার জাতি–

---

১. এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, পয়গাম্বরদের উম্মাতরা এমনি করে তাদের আসল ধর্ম (ইসলাম)-কে বিকৃত করে নিজেরা এমন সব ধর্ম তৈরী করে নিয়েছে, বর্তমানে যা বিভিন্ন নামে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত ঈসা (আ) যে ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাও ছিল ইসলাম। তাঁর তিরোধানের পর অনুগামীরা হযরত ঈসা (আ)-কেই তাদের উপাস্য করে নিয়েছে এবং তাঁর দেয়া শিক্ষার সাথে নতুন নতুন বিধান মিশিয়ে এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে তারই নাম হচ্ছে ঈসায়ী বা খৃষ্ট ধর্ম।

সমূহকে শিক্ষিত করে তুলতে কত হাযার বছর চলে গিয়েছিল, তা আল্লাহ-ই জানেন। অবশেষে উন্নতি করতে করতে মানব সমাজ এমন এক সময়ে এসে পৌঁছলো, যখন সে তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে পরিণতির স্তরে আসতে শুরু করল। বাণিজ্য, শিল্প ও স্থাপত্যের অগ্রগতি হবার ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হল। চীন, জাপান থেকে শুরু করে ইউরোপ আফ্রিকার দূর দূরান্ত পর্যন্ত কায়েম হল জাহাজ চলাচল ও স্থল পথে সফরের ধারা। অধিকাংশ জাতির বর্ণমালা উদ্ভব হল এবং লেখাপড়ার রেওয়াষ শুরু হল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হল এবং জাতিসমূহের মধ্যে চিন্তা ও জ্ঞানের বিনিময় চলতে লাগল। বড় বড় দিগ্বিজয়ী জন্ম লাভ করল এবং তারা বড় বড় সাম্রাজ্য কায়েম করে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতিকে এক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে মিলিত করল। এমনি করে মানব জাতির বিভিন্ন কওমের মধ্যে গোড়ার দিকে যে দূরত্ব ও পার্থক্য দেখা যেতো, ক্রমে ক্রমে তা হ্রাস পেতে লাগলো এবং তখন ইসলামের একই শিক্ষা ও একই জীবন বিধান (শরীয়াত) তামাম দুনিয়ার কাছে পেশ করার সম্ভাবনা দেখা দিল। আজ থেকে আড়াই হাযার বছর আগে মানুষের এতটা উন্নতি হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই এক সার্বজনীন জীবন বিধানের প্রয়োজন অনুভব করছিল। বৌদ্ধ ধর্ম যদিও কোন পূর্ণাংগ ধর্ম-বিধান ছিল না এবং তাতে কেবল নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত কতিপয় নীতির সমাবেশ হয়েছিল, তথাপি হিন্দুস্তান থেকে বেরিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম একদিকে জাপান ও মংগোলিয়া পর্যন্ত এবং অপর দিকে আফগানিস্তান ও বোখারা পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। এ ধর্মমতের প্রচারকগণ বহু দূর দূরান্তের নানা দেশ পর্যটন করেছিলেন। এর কয়েক শতাব্দী পরে উদ্ভব হল ঈসায়ী ধর্মের। যদিও হযরত ঈসা (আ) ইসলামের শিক্ষা নিয়েই এসেছিলেন, তথাপি তাঁর তিরোধানের পর ঈসায়ী ধর্ম নামে এক বিকৃত ধর্ম তৈরী করে নেয়া হয়েছিল এবং ঈসায়ীরা এ ধর্মকে ইরান থেকে শুরু করে আফ্রিকা ও ইউরোপের দূর-দূরায নানা দেশে ছড়িয়ে দিল। বস্তুত দুনিয়া তখন এক সাধারণ মানব ধর্মের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছিল এবং তাঁর জন্য এতটা প্রস্তুত ছিল যে, যখন তেমন কোন পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল জীবন বিধানের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন অপরিণত ও অসম্পূর্ণ ধর্মসমূহকেই বিভিন্ন কওমের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করলো।

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুয়াত

এমন এক সময় এলো, যখন সারা দুনিয়ার ও মানবজাতির সকল কওমের জন্য এক পয়গাম্বর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে আল্লাহ তা'য়ালা আরব দেশে পয়দা করলেন এবং তাঁকে ইসলামের পূর্ণ শিক্ষা ও পূর্ণাঙ্গ বিধান দান করে তা সারেজাহানে প্রচার করার মহাকর্তব্যে নিযুক্ত করেন।

দুনিয়ার ভূগোল পর্যালোচনা করলে প্রথম দৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় যে, সারা দুনিয়ার পয়গাম্বরীর জন্য যমীনের বুকে আরবের চেয়ে অধিকতর উপযোগী আর কোন স্থান হতে পারে না। এ দেশটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইউরোপও এখান থেকে অত্যন্ত নিকটবর্তী। বিশেষ করে তখনকার দিনে ইউরোপের সভ্য জাতিসমূহ ইউরোপের দক্ষিণ অংশে বাস করতো এবং সে অংশটি আরব থেকে হিন্দুস্তানের মতই নিকটবর্তী ছিল।

আবার তখনকার দিনের দুনিয়ার ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে যে, এ নবুয়াতের জন্য তখনকার দিনে আরব কওমের চেয়ে উপযোগী আর কোন কওম ছিল না। আর সব বড় বড় কওম তখন দুনিয়ার বুকে নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আরবরা ছিল তখনো তাজা তারুণ্যের অধিকারী কওম। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে অন্যান্য কওমের চালচলনে এসেছিল বহুবিধ বিকৃতি ; কিন্তু আরব কওমের উপর তখনো তেমন কোন সভ্যতার প্রভাব পড়েনি, যার ফলে তারা আরাম প্রয়াসী, আয়েশ-প্রিয় ও হীন স্বভাব সম্পন্ন হতে পারে। ঈসায়ী ছয় শতকে আরব ছিল সে যুগের সভ্যতাগর্বিত জাতিসমূহের দুষ্ট প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে জাতির মধ্যে সভ্যতার হাওয়া লাগেনি তার মধ্যে মানবীয় গুণরাজির জৌলুস যতটা থাকা সম্ভব, তা আরবদের মধ্যে ছিল। তারা ছিল বীর্যবান, নির্ভীক ও মহৎপ্রাণ; তারা প্রতিশ্রুতি পালন করতো, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন জীবন ভালবাসতো তারা, অপর কোন জাতির গোলামী তারা স্বীকার করতো না। আপনার ইয্যত বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে তারা কুণ্ঠিত হতো না। তারা অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতো এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি তাদের কোন আসক্তি ছিল না। নিসন্দেহে তাদের মধ্যে নানা প্রকার দুষ্কৃতির অস্তিত্ব ছিল তার বিবরণ পরে জানা যাবে; কিন্তু তাদের সে দুষ্কৃতির কারণ ছিল এই যে, আড়াই হাযার বছরের মধ্যে তাদের দেশে কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাব হয়নি,[১] তাদের মধ্যে নৈতিক, সংস্কৃতির সাধন ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা দানের যোগ্যতা নিয়ে কোন সংস্কারক আসেননি। বহু শতাব্দী ধরে রুক্ষ উষর মরুর বুকে স্বাধীন জীবন যাপনের ফলে তাদের মধ্যে মূর্খতা ও জাহেলী ভাবধারা প্রসার লাভ করেছিল এবং তারা তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত চালচলনে এতটা কঠোর ও দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর সাথে সাথে তাদের মধ্যে অবশ্যি এমন এক

---

১. হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জামানা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আড়াই হাযার বছর আগে অতীত হয়ে গিয়েছিল। তারপর এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আরবে আর কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাব হয়নি।

যোগ্যতা সঞ্চিত ছিল যে, কোন প্রতিভা-দীপ্ত মানুষ তাদের জীবন সংস্কার সাধনের জন্য এগিয়ে এলে এবং তাদেরকে কোন মহান লক্ষ্যের নির্দেশ দিয়ে প্রবুদ্ধ করলে তারা সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সারা দুনিয়াকে ওলট পালট করতেও পশ্চাৎপদ হতো না। সারেজাহানের পয়গাম্বরের শিক্ষার প্রসার সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক তারুণ্য-দীপ্ত শক্তিশালী কওমের।

এরপর আরবী ভাষাও লক্ষণীয়। আরবী ভাষা পাঠ করলে এবং তার সাহিত্য সম্পদের পরিচয় লাভ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, উচ্চ চিন্তাধারার প্রকাশ এবং আল্লাহর জ্ঞানের মাধুর্য সূক্ষ্মতাপূর্ণ রহস্য বর্ণনা করে মানব-অন্তরকে প্রভাবিত করার জন্য এর চেয়ে উপযোগী আর কোন ভাষা হতে পারে না। এ ভাষায় ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত কথা বা বাক্যের মাধ্যমে বিরাট বিরাট ভাব প্রকাশ করা যায় এবং তার প্রকাশভংগী এত বলিষ্ঠ যে, তীর বা বর্শার মতো তা মানুষের অন্তরকে বিদ্ধ করে। এ ভাষার মাধুর্য মানব-কর্ণে মধু বর্ষণ করে। তার মধুর সুর-লহরী মানব অন্তরকে অলক্ষ্যে ছন্দ-পাগল করে তোলে কুরআনের মতো মহাগ্রন্থের বাহন হবার জন্য এমনি এক ভাষারই প্রয়োজন ছিল।

এখানেই আল্লাহ তা'য়ালার মহাজ্ঞানের প্রকাশ যে, তিনি তাঁর সর্বশেষ বিশ্বনবীকে প্রেরণের জন্য এ আরব ভূমিকেই মনোনীত করেছিলেন। যে পবিত্র সত্তাকে আল্লাহ তা'য়ালা এ মহত্তম কর্তব্যের জন্য মনোনীত করেছিলেন, তিনি কেমন অতুলনীয় ছিলেন, এখন তারই বর্ণনা পেশ করব।

নবুয়্যাতে মুহাম্মাদীর প্রমাণ

আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। দুনিয়ায় তখন না ছিল তারবার্তার ব্যবস্থা, না ছিল টেলিফোন না ছিল রেলগাড়ী, না ছিল ছাপাখানা, না ছিল পত্র-পত্রিকা, না ছিল বই-পত্র, না ছিল বিদেশ সফরের সুযোগ-সুবিধা—যা আমরা আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছি। এক দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে হলে অতিক্রম করতে হতো কয়েক মাসের পথ। এমনি অবস্থায় আরব দেশ ছিল দুনিয়ার আর সব দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। তার আশে-পাশে ছিল ইরান, তুরস্ক ও মিসর এবং সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কিছুটা ছিল। কিন্তু প্রকান্ড বালুর সমুদ্র সেসব দেশ থেকে আরবকে আলাদা করে রেখেছিল। আরব সওদাগররা মাসের পর মাস উটের পিঠে পথ চলে সেসব দেশে তেজারতের জন্য যেতো কিন্তু তাদের সে সম্পর্ক কেবল পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরব ভূমিতে তখনো কোন উচ্চাংগের সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল না সেখানে না ছিল বিদ্যালয় না ছিল গ্রন্থাগার, না ছিল

সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে লেখা-পড়ার চর্চা। সারা দেশে গণনা করার মতো স্বল্প সংখ্যক লোক ছিল, যারা কিছুটা লেখা-পড়া জানতো, কিন্তু তাও সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কোন সুগঠিত সরকারের অস্তিত্ব ছিল না সেখানে। কোন আইন-কানুন ছিল না। প্রত্যেক গোত্র তার নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাতন্ত্র চালিয়ে যেতো। সারা দেশে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট লুট-তরায চলতো। খুন-খারাবী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল সেখানকার নিত্য প্রচলিত ব্যাপার। মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিল না সেখানে, যার উপর যার কোনরূপ আধিপত্য চলতো তাকে হত্যা করে সে তার সম্পত্তি দখল করে বসতো। তাদের ভিতরে কোন নীতিবোধ বা সভ্যতার সংস্পর্শ ছিল না। দুষ্কৃতি, শরাবখোরী ও জুয়া ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। একে অপরের সামনে নিরাবরণ হতে তাদের দ্বিধা ছিল না। এমন কি আরব-নারীরা উলংগ অবস্থায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করত। হারাম ও হালালের কোন পার্থক্য ছিল না তাদের জীবনে। আরবদের আযাদী এতটা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, তারা কোন নিয়ম, কোন আইন, কোন নৈতিক পদ্ধতি মেনে চলতে তৈরী ছিল না, কোন নেতার আনুগত্য তারা কবুল করতে পারতো না। আরবদের অজ্ঞতা এমন চরম রূপ গ্রহণ করেছিল যে, তারা পাথরের মূর্তিকে পূজা করত। পথ চলতে কোন সুন্দর পাথরের টুকরা পাওয়া গেলে তা তুলে এনে সামনে বসিয়ে তারা পূজা করত। যে শির কারুর কাছে অবনমিত হতে রাযী হতো না, সামান্য পাথরের সামনে তা ঝুঁকে পড়তো এবং মনে করা হতো যে, সেই পাথরই তাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারে।

এমন অবস্থায় এমন এক জাতির মধ্যে একটি মানুষের আবির্ভাব হল। শৈশবেই পিতা-মাতা ও পিতামহের স্নেহের ছায়া থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। অতীতের সেই অবস্থার মধ্যে যেটুকু শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ছিল তাও তাঁর ভাগ্যে জুটলো না। বড় হয়ে তিনি আরব-শিশুদের সাথে ছাগল চরাতে লাগলেন। যৌবনে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন বাণিজ্যে। তাঁর উঠা-বসা, মেলামেশা সব কিছুই হতে লাগলো সেই আরবদের সাথে, যাদের অবস্থা আগেই বলা হয়েছে। শিক্ষার নাম গন্ধ নেই, এমন কি সামান্য পড়াশুনাও তিনি জানেন না, কিন্তু তা সত্তেও তাঁর চালচলন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র তাঁর চিন্তাধারা ছিল অপর সবার চেয়ে আলাদা। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, কারুর সাথে দুর্বাক্য উচ্চারণ করেন না, কঠোর বাক্যের পরিবর্তে মধু বর্ষিত হয় তাঁর মুখ থেকে, আর তার প্রভাবে মানুষ মুগ্ধ হয়ে আসে তাঁর কাছে। কারুর একটি পয়সাও তিনি অবৈধভাবে গ্রহণ করেন না। তাঁর বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ মানুষ তাদের বহু মূল্যবান সম্পত্তি রেখে দেয় তাঁর হেফাযতে এবং তিনি প্রত্যেকের সম্পত্তি

হেফাযত করে নিজের জীবনের মতো। সমগ্র কওম তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'আল-আমিন' নামে আখ্যায়িত করে। তাঁর লজ্জাশীলতাবোধ এমন প্রখর যে, শৈশব থেকে কেউ তাঁকে কোন দিন নিরাবরণ দেখেনি। তিনি এমন সদাচারী যে, দূরাচারী ও দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির মধ্যে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্ববিধ অসদাচরণ ও অশোভন কার্যকলাপকে ঘৃণা করেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি কার্যে পাওয়া যায় পরিচ্ছন্নতার পরিচয়। চিন্তাধারার পবিত্রতার দরুন তিনি নিজ জাতির মধ্যে লুট-তরায ও খুন-খারাবি দেখে অন্তরে গভীর দুঃখ অনুভব করেন এবং লড়াইয়ের সময়ে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁর কোমল অন্তর প্রত্যেক মানুষের দুঃখ-বেদনার শরীক হয়। ইয়াতিম ও বিধবাকে তিনি সাহায্য করেন, ক্ষুধিতের মুখে খাদ্য তুলে দেন, মুসাফিরকেও সাদরে ঘরে ডেকে নিয়ে খেতে দেন। তিনি কাউকেও দুঃখ দেন না, নিজে অপরের জন্য দুঃখ বরণ করেন। নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী তিনি, মূর্তিপূজারী কওমের মধ্যে থেকেও মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করেন। কখনো কোন সৃষ্টির সামনে তাঁর মাথা নত হয় না। তাঁর অন্তর থেকে স্বতঃই আওয়াজ আসে যমীন-আসমানে যা কিছু দেখা যায়, তার মধ্যে কেউ নেই উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। তাঁর দিল আপনা থেকেই বলে ওঠে ঃ আল্লাহ তো একজনই মাত্র হতে পারেন এবং তিনি অদ্বিতীয়—একক। এক বর্বর জাতির মধ্যে এ মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হল, যেন এক প্রস্তর স্তুপের মাঝখানে এক দীপ্তমান হীরকখন্ড, যেন ঘনঘোর অন্ধকারের মাঝখানে এক প্রদীপ্ত দীপশিখা।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এমনি পবিত্র পরিচ্ছন্ন উচ্চাংগের মহৎ জীবন যাপনের পর তিনি চারিদিকের ঘনিভূত ঘনঘোর অন্ধকার দেখে হাঁপিয়ে ওঠেন, অজ্ঞতা, নীতিহীনতা, পাপাচার, দুর্নীতি, শির্‌ক ও পৌত্তলিকতার ভয়াবহ সমুদ্র বেষ্টন থেকে তাঁর অন্তর চায় মুক্তি, কারণ সেখানকার কোন কিছুই তাঁর মনোভাবের অনুকূল নয়। অবশেষে তিনি জনতা থেকে দূরে এক পর্বতের গুহায় গিয়ে নির্জনতা ও প্রশান্তির দুনিয়ায় কাটিয়ে দেন দিনের পর দিন। অনাহারে থেকে থেকে তিনি আরো পরিশুদ্ধ করে তোলেন তাঁর আত্মাকে, তাঁর চিত্তকে, তাঁর মস্তিষ্ককে। সেখানে তিনি ভাবেন, চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকেন, সন্ধান করেন এক নতুন আলোকের, যে আলোর দীপবর্তিকা ধারণ করে তিনি দূর করতে পারেন তাঁর চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকার। তিনি সন্ধান করেন এক শক্তির উৎস, যা দিয়ে তিনি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবেন এ বিকৃত দুনিয়াকে কায়েম করবেন মানবতার সুষ্ঠু ও সুন্দর কাঠামো।

এ ধ্যান-তন্ময়তার মাঝখানে তাঁর জীবনে এলো এক বিপুল আত্মিক পরিবর্তন। তাঁর প্রকৃতি এতকাল ধরে সন্ধান করেছিল যে আলোক, আর অন্তরে অকস্মাৎ আবির্ভূত হল তার দীপ্ত রশ্মি। অকস্মাৎ তাঁর অন্তরে এলো এমন এক

শক্তি, যার প্রকাশ তিনি আর কোনদিন অনুভব করেননি। পর্বত গুহার নির্জন পরিবেশ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে জনতার সামনে, আপন কওমের কাছে এসে তিনি তাদেরকে জানালেন ঃ প্রস্তর মূর্তির কোন শক্তি নেই, তার পূজা বর্জন কর। এ চাঁদ, এ সূর্য, এ যমীন ও আসমানের সকল শক্তি এক আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি, তিনিই তোমাদের সকলের স্রষ্টা, তিনিই রিযকদাতা, জীবন-মৃত্যু সবকিছুই তার নিয়মের অধীন। সবাইকে ছেড়ে একমাত্র তাঁরই উপাসনা কর, তারই কাছে মনোবাসনার সিদ্ধি কামনা কর। চুরি, ডাকাতি, লুট-তরায, শরাবখোরী, জুয়া, প্রতারণা—যা কিছু করছো তোমরা, এসব পাপ—আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী এসব দুষ্কৃতি পরিত্যাগ কর। সত্য কথা বল, ন্যায়-বিচার কর, কারুর প্রাণনাশ কর না, কারুর সম্পত্তি হরণ কর না, যা কিছু গ্রহণ কর সত্যের পথে গ্রহণ কর, যা কিছু দান কর সত্যের পথে দান কর। তোমরা সবাই মানুষ, সকল মানুষ পরস্পর সমান। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব (শরাফত) তার বংশ মর্যাদার নয়—বর্ণ, রূপ ও সম্পদে নয়। আল্লাহ-পরস্তি, সৎকর্ম ও পবিত্র জীবন যাত্রাই হচ্ছে মানুষের শরাফতের নিদর্শন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করে, সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করে, সে-ই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ। যে ব্যক্তি তার ব্যতিক্রম করে তার কোন গৌরবই নেই। মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে হাযির হতে হবে স্রষ্টার সামনে চূড়ান্ত বিচারদিনের সেই সত্যিকার ন্যায়বিচারকের সামনে গ্রাহ্য হবে না কোন সুপারিশ অথবা উৎকোচ। সেখানে প্রশ্ন উঠবে না কোন বংশ মর্যাদার। সেখানে হবে কেবল ঈমান ও সৎকর্মের হিসেব। যার কাছে এসব সম্পদ থাকবে তার বাসভূমি হবে জান্নাত এবং যার কাছে এর কোন কিছুই থাকবে না তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে হতাশা ও দোযখের শাস্তি।

তখনকার আরবের জাহেল কওম এ পূণ্যাত্মা মানুষটির উপর দুর্ব্যবহার করে তাঁকে হয়রান করেছে কেবলমাত্র এ অপরাধে যে, তনি তাদের বাপ-দাদার আমলে প্রচলিত কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন এবং পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত জীবন পদ্ধতির খেলাফ শিক্ষা দান করেছেন। এ অপরাধে তারা তাঁকে অকথ্য গালি দিতে লাগল, পাথর মেরে মেরে তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলল। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। একদিন দু'দিন নয়, ক্রমাগত তের বছর ধরে তাঁর উপর চালিয়ে গেল কঠিনতম নির্যাতন, অবশেষে তাঁকে স্বদেশের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে হল বিদেশে। দেশ ছেড়ে যেখানে তিনি আশ্রয় নিলেন, সেখানেও তাঁকে তারা কয়েক বছর ধরে পেরেশান করতে লাগল।

এত সব দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন তিনি কেন সহ্য করলেন ? তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তার কওমকে সত্যের সহজ-সঠিক পথ নির্দেশ করা। তার জাতি

তাকে বাদশাহের মর্যাদা দান করতে প্রস্তুত ছিল, তার পায়ের উপর ঢেলে দিতে চেয়েছিল সম্পদের স্তুপ। তারা চাইত কেবল তাকে সত্য প্রচার থেকে বিরত রাখতে। তিনি তাদের সকল প্রলোভনকে অকাতরে উপেক্ষা করে আপন লক্ষ্যে অবিচল রইলেন। যে মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য নয়, অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য ক্রমাগত দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে যান, তার চেয়ে বড় মহৎ অন্তঃকরণ ও সততার কল্পনা আর কারুর মধ্যে করা যায় কি? যাদের কল্যাণের জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারাই তাঁকে পাথর মেরে আহত করছে আর তিনি প্রতিদানে তাদের কল্যাণই কামনা করছেন। মানুষ তো দূরের কথা, ফিরেশতাও এমনি সততার নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়।

বিশেষ করে দেখা দরকার যে, এ মানুষটি যখন পর্বত গুহা থেকে এ সত্যের বাণী নিয়ে বেরিয়ে এলেন মানব সমাজের সামনে, তখন তাঁর মধ্যে ঘটে গেল কত বড় বিপ্লব। যে বাণী তিনি মানুষকে শুনাতে লাগলেন, তা এমন স্বচ্ছ-সাবলীল, ভাষা ও সাহিত্যের মানদন্ডে এতই উচ্চাংগের ও অলংকারপূর্ণ যে, তাঁর আগে অথবা পরে এমন কথা কেউ কোন দিন বলেনি। কাব্য, বাগ্মিতা ও ভাষার স্বচ্ছতা নিয়ে আরবরা গর্ব করে বেড়াত। আরবের জনগণের সামনে তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন কালামে পাকের সূরার মত একটি মাত্র সূরা পেশ করতে, কিন্তু তাঁর সে চ্যালেঞ্জের সামনে সবারই মাথা নত হয়ে গেল। এ বিশষ কালামের (কুরআন শরীফ) ভাষা যেমন ছিল, তাঁর সাধারণ আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতার ভাষা কিন্তু তেমন উচ্চাংগের ছিল না। আজও যখন আমরা তাঁর নিজস্ব অন্যান্য বাণীর সাথে এ কালামের তুলনা করি, তখন তার মধ্যে ধরা পড়ে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য।

এ মানুষটি—এ আরব মরুর অক্ষরজ্ঞানবর্জিত মানুষটি যে জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করলেন, তাঁর আগে আর কোন মানুষ এমন কথা বলেনি, তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কেউ তেমনটি বলতে পারেনি; এমন কি, চল্লিশ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত তাঁর মুখে কেউ এমন কথা শুনেনি।

এ উম্মী (নিরক্ষর) মানুষটি নৈতিক-জীবন ও সামাজিক-জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও মানব-জীবনের অন্যান্য সকল দিক সম্পর্কে এমন সব বিধান রচনা করে গেছেন যে, বড় বড় বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা বহু বছরের চিন্তা-গবেষণা ও সারা জীবনের পরীক্ষা-নীরিক্ষা দ্বারা বহু কষ্টে তার নিগূঢ় তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে এবং দুনিয়ার মানবীয় অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত বেশী করে প্রসার লাভ করছে, ততই তার নিগূঢ় তাৎপর্য মানুষের কাছে সুস্পষ্টতর হয়ে উঠছে। তেরশ' বছরের অধিক কাল অতীত হয়ে গেছে; কিন্তু আজো তাঁর রচিত বিধানের মধ্যে কোন সংশোধনের অবকাশ অনুভূত হচ্ছে

না। দুনিয়ার মানব-রচিত বিধান ইতিমধ্যে হাযার হাযার বার রচিত হয়েছে ও বাতিল হয়ে গেছে ; প্রত্যেক পরীক্ষায় এসব বিধান ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বার তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছে। কিন্তু এ নিরক্ষর মরুবাসী অপর কোন মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে যে বিধান মানুষের সামনে পেশ করে গেছেন, তার একটি ধারাও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি।

নবুয়াতের ২৩ বছরের মধ্যে তিনি নিজস্ব চরিত্র মাধুর্য, সততা, মহত্ত্ব ও উচ্চাংগের শিক্ষার প্রভাবে দুশমনদেরকে বানিয়েছিলেন দোস্ত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিদেরকে পরিণত করেছিলেন সহযোগীতে। বড় বড় শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে। বিজয়ী হয়েও তিনি কোন দুশমনের উপর তার দুশমনির বদলা নেননি, কারুর প্রতি তিনি কঠোর আচরণ করেননি। যে ব্যক্তি তাঁর আপন চাচাকে হত্যা করে তার কলিজা বের করে চিবিয়েছিল তার উপর বিজয়ী হলেও তিনি তাকে মাফ করেছিলেন, যারা তাঁকে পাথর মেরেছিল, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল, তাদেরকে হাতে পেয়েও তিনি মার্জনা করেছিলেন। তিনি কারুর সাথে প্রতারণা করেননি, কখনো কোন প্রতিশ্রুতি ভংগ করেননি। লড়াইয়ের মধ্যেও তিনি কোন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেননি; তাঁর কঠিনতম দুশমনও কোনদিন তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ ও যুলুমের অপবাদ আনতে পারেনি। তাঁর এ অতুলনীয় সততার প্রভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত সারা আরবের অন্তর জয় করেছিলেন। উপরের বর্ণনায় যে আরবদের অবস্থার পরিচয় পাওয়া গেল, নিজস্ব শিক্ষা ও হেদায়াতের প্রভাবে তিনি সেই আরবদেরকে বর্বরতা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুসভ্য জাতিতে পরিণত করলেন। যে আরব কোন আইনের আনুগত্য স্বীকার করতে রাযী ছিল না, তাদেরকে তিনি এমন আইনানুগ করে তুললেন যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এমন আইননুসারী কওম আর দেখা যেত না। যে আরবদের মধ্যে অপরের আনুগত্য প্রবণতা মোটেই ছিল না, তাদেরকে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অনুগত করে দিলেন। যে মানুষের গায়ে কোন দিন নীতিবোধের হাওয়া পর্যন্ত লাগেনি তাদেরকেও তিনি এমন নৈতিক-চরিত্রসম্পন্ন করে তুললেন যে, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে আজ দুনিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে যায়। তখনকার দিনে যে আরবরা দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে হীন মর্যাসম্পন্ন ছিল, এ একটি মাত্র মানুষের প্রভাবে তেইশ বছরের মধ্যে তারা এমন প্রবল শক্তিমান হয়ে উঠল যে, তারা ইরান, রোম ও মিসরের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটদের সিংহাসন উলটিয়ে দিল ; দুনিয়াকে তারা দিল তাহযিব-তামাদ্দুন, নৈতিক জীবন ও মানবতার শিক্ষা ; ইসলামের এক শিক্ষা ও এক শরীয়াত নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়লো এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সুন্দরতম এলাকা পর্যন্ত।

এ'তো গেল আরব কওমের উপর ইসলামের প্রভাব। এর চেয়ে বেশী বিস্ময়করভাবে নিরক্ষর আরব-নবীর প্রভাব পড়েছিল তামাম দুনিয়ার উপর। তিনি সারা দুনিয়ার প্রচলিত চিন্তাধারা, আচরণ-পদ্ধতি ও আইন-কানুনের মধ্যে আনলেন এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। যারা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল, তাদের কথা ছেড়ে দিলেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা তার আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যারা তার বিরোধিতা করেছে তার সাথে দুশমনী করেছে, তারাও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি। দুনিয়া তাওহীদের শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল, তিনি মানুষকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন সেই শিক্ষা। এবং এমন জোরের সাথে সত্যের ভেরী বাজালেন যে, আজ বুতপরস্ত ও মুশরিকদের ধর্ম পর্যন্ত তাওহীদের স্বীকৃতি দান করতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি এমন বলিষ্ঠ নৈতিক শিক্ষা মানুষকে দিয়ে গেছেন যে, তার বিধিবদ্ধ নীতি আজ তামাম দুনিয়ার প্রচলিত নৈতিক শিক্ষায় প্রসার লাভ করেছে ও করছে। আইন, রাজনীতি, সভ্যতা ও সামাজিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে নীতি তিনি নির্ধারণ করে গেছেন, তা এমন সত্যাশ্রিত ও সর্বকালে প্রযোজ্য যে, তার বিরোধী সমালোচকরা পর্যন্ত নীরবে তা থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করে নিয়েছে এবং এখনো নিচ্ছে।

আগেই বলেছি, এ অসাধারণ মানুষটি জন্ম নিয়েছিলেন এক জাহেল কওমের মধ্যে এক ঘনঘোর তমসাচ্ছন্ন দেশে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পশুচারণ ও সওদাগরী ছাড়া আর কোন বৃত্তি তিনি অবলম্বন করেননি। কোন রকম শিক্ষা-দীক্ষা তিনি লাভ করেননি। ভেবে দেখবার বিষয়, চল্লিশ বছর বয়সের পর তাঁর মধ্যে আকস্মিকভাবে এতটা পূর্ণতা এলো কোত্থেকে? কোত্থেকে তার মধ্যে এলো অপূর্ব জ্ঞানসম্ভার? কোত্থেকে তিনি পেলেন এ বিপুল শক্তি? একটিমাত্র মানুষ—কখনো তিনি এক অসাধারণ সিপাহসালার, কখনো এক অতুলনীয় জ্ঞানসম্পন্ন বিচারপতি, কখনো মহাশক্তিধর বিধানকর্তা, কখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক, কখনো নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অতুলনীয় সংস্কারক, আবার কখনো বিস্ময়কর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন নেতা! জীবনের বহুমুখী কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও রাত্রিকালে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেন আল্লাহর ইবাদাতে, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক আদায় করেন, গরীব ও বিপন্ন মানুষের খেদমত করেন। এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করেও ফকীরের মত জীবন যাপন করেন ; মাদুরের উপর শয়ন করেন, মোটা কাপড় পরিধান করেন, গরীবের মত খাদ্য গ্রহণ করেন, এমন কি কখনো অনশনে অর্ধাশনে কেটে যায় তার দিন।

এমনি বিস্ময়কর অতি-মানবীয় পূর্ণতার পরিচয় দিয়ে তিনি যদি দাবী করতেন যে, তিনি অতি মানবীয় অস্তিত্বের অধিকারী, তা হলে কেউ তার সে

দাবী অগ্রাহ্য করতে পারতো না, কিন্তু তার বদলে তিনি কি বলেছেন ? তার সে পূর্ণতাকে তিনি নিজস্ব কৃতিত্ব বলে দাবী করেননি, বরং তিনি হামেশা বলতেন ঃ

আমার কাছে আপনার বলতে কিছুই নেই ; এর সবকিছুর মালিক আল্লাহ এবং আল্লাহর তরফ থেকেই এসব আমি পেয়েছি, যে বাণী আমি পেশ করছি এবং যার অনুরূপ বাণী পেশ করতে সকল মানুষ ব্যর্থ হয়েছে, তা আমার নিজস্ব বাণী নয়, তা আমার মস্তিষ্ক প্রসূত রচনা নয়। এ হচ্ছে আল্লাহর কালাম এবং এর সবটুকু প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আমার যা কিছু কার্যকলাপ, তাও আমার নিজস্ব যোগ্যতা দ্বারা সম্পন্ন হয়নি, কেবলমাত্র আল্লাহরই নির্দেশে তা সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহর কাছ থেকে যে ইংগিত আমি পাই অনুরূপভাবেই আমি কাজ করি এবং কথা বলি।

এমনি সত্যনিষ্ঠ মানুষকে আল্লাহর পয়গাম্বর না মেনে পারা যায় কি করে ? তিনি এমন পূর্ণতার অধিকারী যে, তামাম দুনিয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তার মত একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তার সত্যনিষ্ঠা এমন অসাধারণ যে, সেই পূর্ণতার গর্ব তাঁর ভিতরে মোটেই নেই। সেই পূর্ণতার জন্য তিনি কোন প্রশংসা অর্জন করতে চান না। সকল প্রশংসা সুস্পষ্টভাবে তাঁরই প্রতি আরোপ করেন, যিনি তাঁকে সবকিছু দান করেছেন। কি করে তাঁকে সত্য বলে স্বীকার না করে পারা যায় ? তিনি নিজে যখন তাঁর সবটুকু শ্রেষ্ঠত্বকে আল্লাহর বলে স্বীকার করেন, তখন আমরা কেন বলব ঃ না, এর সবকিছু তোমার আপন মস্তিষ্কের সৃষ্টি ? মিথ্যাচারী মানুষই তো অপরের কৃতিত্বকে আপনার দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করে ; কিন্তু এ মানুষটি যেসব কৃতিত্বকে সহজেই আপনার বলে দাবী করতে পারতেন যেসব কৃতিত্ব অর্জন করার কারণ কারুর জানা ছিল না। এবং যা প্রদর্শন করে তিনি অতিমানবীয় মর্যাদা দাবী করলেও কেউ তা অগ্রাহ্য করত না, সেসব কৃতিত্বকেও তিনি তার আপনার দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করেননি। তাহলে তার চেয়ে অধিকতর সত্যাশ্রয়ী মানুষ আর কে হতে পারে ?

এ মানুষটি—এ অসাধারণ কৃতিত্বসম্পন্ন মানুষটি ছিলেন আমাদের নেতা তামাম জাহানের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)। তার নিজস্ব সত্যনিষ্ঠাই হচ্ছে তার পয়গাম্বরীর অকাট্য প্রমাণ। তাঁর গৌরবময় কার্যকলাপ তাঁর স্বভাব-চরিত্র, তাঁর পবিত্র জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সবকিছুই ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি স্বচ্ছ অন্তঃকরণে সত্যানুসন্ধিৎসা ও ন্যায়ের মনোভাব সহকারে তাঁর সে বিবরণ পাঠ করবে, তার অন্তর স্বতঃই সাক্ষ্য দান করবে যে, তিনি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর পয়গাম্বর। যে বাণী তিনি পেশ

করেছিলেন, তা-ই হচ্ছে কুরআন, তা-ই আমরা পাঠ করে থাকি। যে ব্যক্তি এ অতুলনীয় কিতাব হৃদয়ংগম করে মুক্ত অন্তরে পাঠ করবে তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এ নিশ্চিতরূপে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ এবং কেন মানুষের মধ্যে নেই এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষমতা।

খতমে নবুয়াত

এ কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ যুগে ইসলামের সত্য সহজ ও সঠিক পথের নির্দেশ জানার জন্য হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর শিক্ষা ও কুরআন মজীদ ছাড়া আর কোন মাধ্যম নেই। মুহাম্মাদ (সা) সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহর পয়গাম্বর। তাঁর মধ্যেই পয়গাম্বরীর ধারা শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে মানুষকে হেদায়াত করতে চান, তার সবকিছুর নির্দেশ তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর আখেরী পয়গাম্বরের মাধ্যমে। এখন যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী ও আল্লাহর মুসলিম বান্দাহ হতে ইচ্ছুক, তার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর আখেরী পয়গাম্বরের উপর ঈমান আনা, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা মেনে নেয়া এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলা।

খতমে নবুয়াতের প্রমাণ

পয়গাম্বরীর তাৎপর্য আগেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই কথাগুলো বুঝে নিলে এবং তা নিয়ে চিন্তা করলে সহজেই জানা যাবে যে, পয়গাম্বর রোজ রোজ পয়দা হয় না, প্রত্যেক কওমের মধ্যে সবসময় পয়গাম্বরের আবির্ভাব হওয়ার প্রয়োজনও নেই। পয়গাম্বরের জীবনই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াতের জীবন। যতক্ষণ তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত জীবন্ত থাকে ততক্ষণ তিনি জীবিত থাকেন। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের মৃত্যু ঘটেছে, কারণ যে শিক্ষা তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন দুনিয়ার মানুষ তা বিকৃত করে ফেলেছে। যেসব গ্রন্থ তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তার কোনটিই আজ অবিকৃত অবস্থায় নেই। তাঁদের অনুগামীরাই আজ দাবী করতে পারছে না যে, তাদের পয়গাম্বরের দেয়া আসল কিতাব তাদের কাছে মওজুদ রয়েছে, তারাই ভুলিয়ে দিয়েছে তাদের পয়গাম্বরের দেখানো পথ। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের মধ্যে একজনেরও নির্ভুল-নির্ভরযোগ্য বিবরণ আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রত্যয় সহকারে আজ বলা যায় না, কোন্ জামানায় তিনি পয়দা হয়েছিলেন? কি কাজ তিনি করে গেছেন? কিভাবে তিনি জীবন যাপন করেছিলেন? কি কি কাজের শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন এবং কি কি কাজ থেকে মানুষকে বিরত করতে চেয়েছিলেন? এমনি করেই হয়েছে তাঁদের সত্যিকার মৃত্যু।

পক্ষান্তরে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আজো রয়েছেন জীবিত, কারণ তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত আজো জীবন্ত হয়ে রয়েছে। যে কুরআন তিনি দিয়ে গেছেন,

তা আজো তার মূল শব্দ-সম্ভারসহ অবিকৃত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে। তার একটি হরফ, একটি নোক্‌তা, একটি যের-যবরের পার্থক্যও হয়নি কোথাও। তাঁর জীবন-কাহিনী, তাঁর উক্তিসমূহ ও কার্যকলাপ সবকিছুই সুরক্ষিত হয়ে আছে। তেরশ' বছরের ব্যবধানে আজো ইতিহাসে তাঁর বর্ণনা এমন সুস্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই, যেন তাঁকে আমরা দেখেছি প্রত্যক্ষভাবে। হযরত (সা)-এর জীবন-কাহিনী যেমন সুরক্ষিত হয়ে রয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোন ব্যক্তির জীবন-কাহিনী তেমন অবিকৃতভাবে সুরক্ষিত হয়নি। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতি মুহূর্তে হযরত (সা)-এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তাতেই প্রমাণিত হয় যে হযরত (সা)-এর পরে আর কোন পয়গাম্বরের প্রয়োজন নেই।

এক পয়গাম্বরের পর অপর কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাবের কেবল মাত্র তিনটি কারণ থাকতে পারে ঃ

এক ঃ যখন পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের শিক্ষা হেদায়াত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং পুনরায় তা পেশ করার প্রয়োজন হয়, দুই ঃ যখন পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং তাতে সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন হয়, তিন ঃ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের শিক্ষা যখন কোন বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং অপর জাতি বা জাতিসমূহের জন্য অপর কোন পয়গাম্বরের প্রয়োজন হয়।[১]

উপরিউক্ত তিনটি কারণের কোনটিই বর্তমানে প্রযুক্ত হতে পারে না, কারণ ঃ

এক ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষা ও হেদায়াত আজো জীবন্ত রয়েছে এবং সেসব মাধ্যম এখন পুরোপুরি সংরক্ষিত রয়েছে, যা থেকে প্রতি মুহূর্তে জানা যায়, হযরতের দ্বীন কি ছিল, কোন্ জীবন পদ্ধতির তিনি প্রচলন করেছিলেন এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতি মিটিয়ে দেবার ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। যখন তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত আজো মিটে যায়নি, তখন আবার তা নতুন করে পেশ করার জন্য কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই।

দুই ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে দুনিয়াকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেয়া হয়ে গেছে। এখন তার মধ্যে যেমন কিছু কম-বেশী করার প্রয়োজন নেই, তেমনি তার মধ্যে এমন কোন ঘাটতি নেই, যা পূরণ করার জন্য

১. চতুর্থ একটি কারণ হতে পারে এই যে, কোন পয়গাম্বরের জীবদ্দশায় তাঁর সাহায্যের জন্য অপর কোন পয়গাম্বর প্রেরণ করা হয় ; কিন্তু উপরে আমি তার উল্লেখ করিনি, কারণ কুরআন মজীদে এ ধরনের মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে এবং এ দু'টি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সাহায্যকারী পয়গাম্বর নাযিল করার কোন সাধারণ নিয়ম আল্লাহর কাছে রয়েছে।

আর কোন নবী আসার প্রয়োজন হবে। সুতরাং দ্বিতীয় কারণটির কোন অস্তিত্ব নেই।

তিন ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সা) কোন বিশেষ কওমের জন্য প্রেরিত না হয়ে তামাম দুনিয়ার জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁর শিক্ষা যথেষ্ট। সুতরাং এখন কোন বিশেষ কওমের জন্য স্বতন্ত্র নবী আসার প্রয়োজন নেই। তাই তৃতীয় কারণটিও এ ক্ষেত্রে অচল।

এসব কারণে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে বলা হয়েছে 'খাতেমুন্নাবীয়্যিন' অর্থাৎ যাঁর ভিতরে নবুয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন আর দুনিয়ায় নতুন কোন নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন নেই ; প্রয়োজন কেবল এমন মানুষের—যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পথে নিজেরা চলবেন ও অপরকে চালাবেন ; যাঁরা তাঁর শিক্ষাধারাকে উপলব্ধি করবেন, তদনুযায়ী, আমল করবেন এবং দুনিয়ায় যে আইন ও বিধান নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা) তশরিক এনেছিলেন, সেই আইন ও বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ঈমানের বিবরণ

আগের অধ্যায়সমূহে যা বলা হয়েছে আরো সম্মুখে অগ্রসর হবার আগে একবার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ঃ

এক ঃ ইসলাম বলতে যদিও বুঝায় আল্লাহর আনুগত্য ও তার আদেশের অনুবর্তিতা, তথাপি আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী তার ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী জীবন যাপনের পদ্ধতি এবং আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহর পয়গাম্বরের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। তাই ইসলামের নির্ভুল সংজ্ঞা অনুসারে পয়গাম্বরের শিক্ষার উপর ঈমান আনা এবং তাঁর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করাই হচ্ছে ইসলাম। যে ব্যক্তি পয়গাম্বরের পথ বর্জন করে সোজাসোজি আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর হুকুমের অনুবর্তিতা করার দাবী করে, সে মুসলিম নয়।

দুই ঃ পূর্বে আলাদা আলাদা কওমের জন্য আলাদা আলাদা পয়গাম্বর এবং একই কওমের মধ্যে ক্রমাগত একের পর এক পয়গাম্বরের আবির্ভাব হয়েছে। তখনকার দিনে প্রত্যেক কওমের জন্য, "ইসলাম" বলতে বুঝাত সেই ধর্ম যা বিশেষ করে সেই কওমের পয়গাম্বর বা পয়গাম্বরগণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদিও ইসলামের প্রকৃতি প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে একই ছিল তথাপি শরীয়াত অর্থাৎ আইন ও ইবাদাতের পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন। এ কারণে এক কওমের জন্য অপর কোন কওমের পয়গাম্বরের অনুসরণ অপরিহার্য ছিল না, যদিও সকল পয়গাম্বরের প্রতি ঈমান পোষণ ছিল অপরিহার্য।

তিন ঃ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) যখন দুনিয়ায় পয়গাম্বর হিসেবে প্রেরিত হলেন, তখন তার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা সুম্পন্ন করে দেয়া হল এবং তামাম দুনিয়ার জন্য একই শরীয়াত প্রেরণ করা হল, তার আনীত শরীয়াত সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য হল। হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সকল পয়গাম্বরের প্রবর্তিত শরীয়াত প্রত্যাহৃত হল এবং এরপর কিয়ামত পর্যন্ত যেমন কোন নবী আসবে না, তেমনি আসবে না কোন নতুন শরীয়াত আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে। সুতরাং বর্তমানে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আনুগত্যের নামই হচ্ছে 'ইসলাম'। তাঁর নবুয়াতের স্বীকৃতি, তাঁর প্রতি প্রত্যয়ের ভিত্তিতে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা মেনে চলা এবং তাঁর সকল হুকুমকে আল্লাহর হুকুম মনে করে তার আনুগত্য করাই হচ্ছে 'ইসলাম'। আর এমন কোন ব্যক্তি আল্লাহর তরফ থেকে আসবেন না যাঁকে মেনে চলা মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত থাকবে এবং যাকে না মানলে মানুষ কাফের হয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মাদ (সা) কোন্ কোন্ জিনিসের উপর ঈমান পোষণ করার শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা মেনে নিলে মানুষ কিরূপ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে ; তা-ই আমি এখন বলব।

আল্লাহর প্রতি ঈমান

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ —"আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।"

এ কালেমা-ই হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ—যা দিয়ে এক কাফের, এক মুশরিক ও এক নাস্তিক থেকে মুসলিমের পার্থক্য নির্ধারিত হয়। এ কালেমার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি দ্বারা এক মানুষ ও অপর মানুষের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রচিত হয়। এ কালেমার অনুসারীরা পরিণত হয় এক জাতিতে এবং অমান্যকারীরা হয় তাদের থেকে স্বতন্ত্র জাতি। এর অনুসারীরা দুনিয়া থেকে শুরু করে আখেরাতে পর্যন্ত উন্নতি, সাফল্য ও সম্মানের অধিকারী হয় এবং অমান্যকারীদের পরিণাম হচ্ছে ব্যর্থতা, অপমান ও পতন।

এ ছোটখাট কথাটি কেবল মুখে উচ্চারণ করার ফলেই মানুষে মানুষে এ বিপুল পার্থক্য রচিত হতে পারে না; মুখে দশ লক্ষ বার 'কুইনিন' 'কুইনিন' বললে এবং তা সেবন না করলে যেমন ম্যালেরিয়া কখনো ছাড়তে পারে না, তেমনি মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করলে, অথচ কি তার অর্থ, এ ক'টি শব্দ উচ্চারণ করে কত বড় জিনিসের স্বীকৃতি দান করা হল এবং এ স্বীকৃতির ফলে নিজের উপর কত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করা হল, তা যদি বুঝতে না পারা যায় তা হলে না বুঝে এমনি উচ্চারণ করার ফলে কারো কোন কল্যাণই সাধিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে প্রার্থক্য কেবল তখনই আসতে পারে, যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র তাৎপর্য অন্তরে প্রতিভাত হবে, তার অর্থের উপর পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাবে এবং তাঁর বিরোধী যত রকম বিশ্বাস আছে, তা থেকে মন সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করবে এবং আগুনের দাহিকা শক্তি ও বিষের মৃত্যু ঘটাবার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস মনে যতটুকু প্রভাব বিস্তার করে এ কালেমার প্রতি বিশ্বাস ও মন-মস্তিষ্কের উপর কমপক্ষে ততটা প্রভাব বিস্তার করবে। যেমন করে আগুনের প্রকৃতি সম্পর্কে ঈমান মানুষকে আগুনের স্পর্শ থেকে দূরে রাখে এবং বিষের প্রকৃতির উপর ঈমান বিষ পান থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে, ঠিক তেমনি করে বিশ্বাস ও কর্মের সকল ক্ষেত্রে এ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার উপর ঈমান শিরক, কুফর, নাস্তিকতা প্রভৃতি দুষ্কৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপ থেকে মানুষকে বিরত করে রাখবে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র অর্থ

'ইলাহ' বলতে কি বুঝায়, সবার আগে তা-ই বুঝে নিতে হবে। আরবী ভাষায় 'ইলাহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে ইবাদাতের যোগ্য ঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও মহত্ত্বের যে সত্তা উপাসনার যোগ্য এবং বন্দেগী ইবাদাতে যাঁর সামনে মস্তক অবনমিত করা যায়। 'ইলাহ' শব্দের অর্থে এ তাৎপর্যও শামিল রয়েছে যে, তিনি হবেন অনন্ত শক্তির অধিকারী, যে শক্তির উপলব্ধি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমানা অতিক্রম করে যায়। 'ইলাহ' শব্দের তাৎপর্যের মধ্যে এও রয়েছে যে, তিনি নিজে কারুর মুখাপেক্ষী হবেন না, অথচ আর সবাই জীবনের সকল ব্যাপারে তাঁর মুখাপেক্ষী হবে এবং তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে। 'ইলাহ' শব্দের মধ্যে রহস্যময়তার অর্থও নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ 'ইলাহ' তাকেই বলা যায়, যাঁর শক্তির উপর থাকবে রহস্যের আবরণ। ফারসী ভাষায় 'খোদা', হিন্দী ভাষায় 'দেবতা', ইংরেজী ভাষায় 'গড' শব্দও এর কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার হয় এবং দুনিয়ার অন্যান্য ভাষায়ও একই অর্থে বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

'আল্লাহ' শব্দটি হচ্ছে একক—লা শরীক আল্লাহর 'ইসমে জাত' বা মৌলিক নাম, মূল সত্তার পরিচায়ক নাম। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটির শব্দগত তরজমা হচ্ছে 'কোন ইলাহ নেই সেই বিশেষ সত্তা ব্যতীত যাঁর নাম আল্লাহ'। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সমগ্র সৃষ্টিতে আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই, যে উপাসনা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে। তিনি ব্যতীত এমন যোগ্যতাসম্পন্ন আর কেউ নেই, ইবাদাত বন্দেগী ও আনুগত্যে যার সামনে মস্তক অবনমিত করা হয়। তিনিই একমাত্র সত্তা, যিনি তামাম জাহানের মালিক ও বিধানকর্তা, সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী, সবাই একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য কামনা করতে বাধ্য। তিনি মানুষের উপলব্ধির বাইরে লুক্কায়িত এবং তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে গিয়ে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র প্রকৃত তাৎপর্য

উপরে তা কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটির শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ করা গেল। এখন তার সঠিক তাৎপর্য পর্যালোচনা করব।

মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগের যেসব তথ্য আমাদের হাতে এসেছে এবং প্রাচীনতম জাতিসমূহের যেসব ধ্বংসাবশেষের সন্ধান আমরা পেয়েছি, তা থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক যুগের মানুষ কোন না কোন খোদাকে মেনে নিয়েছে এবং কোন না কোন ধরনের ইবাদাত করেছে। আজো দুনিয়ার যত

জাতি রয়েছে—তারা নিতান্ত আদিম প্রকৃতির হোক অথবা সুসভ্য হোক, তাদের সবারই মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই যে, তারা কোন বিশেষ সত্তাকে খোদা বলে মানছে, তার ইবাদাত করেছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, খোদার ধারণা মানুষের প্রকৃতির শামিল হয়ে আছে। তার ভিতরে এমন কোন জিনিস রয়েছে যা তাকে বাধ্য করেছে কাউকে খোদা মানতে ও তার ইবাদাত করতে।

এরপর প্রশ্ন ওঠে মানুষের মধ্যে সেই বিশেষ জিনিসটি কি ? প্রত্যেকটি লোক তার নিজের অস্তিত্বের প্রতি ও সকল মানুষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আপনা থেকেই এর জবাব উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ বান্দাহ হয়েই পয়দা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সে পরমুখাপেক্ষী, দুর্বল ও দুঃস্থ। তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যে অসংখ্য জিনিসের প্রয়োজন, তা তার শক্তির আধিপত্যের অধীন নয়। কখনো আপনা থেকেই তা তার হাতে আসে, আবার কখনো বা সে তা থেকে বঞ্চিত হয়।

এমন অনেক জিনিসই তো রয়েছে, যা তার পক্ষে কল্যাণকর। সে তা অর্জন করতে চায়; কিন্তু সেই সব জিনিস কখনো তার হাতে আসে, কখনো বা আসে না ; কারণ সেই সব জিনিস অর্জন করার স্বাধীন ক্ষমতা আদৌ তার নেই।

আবার এমন অনেক জিনিস আছে, যা তার অনিষ্ট সাধন করে, তার সারা জীবনের পরিশ্রম মুহূর্তে বিনষ্ট করে দেয়, তার সকল আশা-আকাংখাকে ধূলি-লুণ্ঠিত করে দেয়, তাকে ব্যাধী ও মৃত্যুর কবলগ্রস্ত করে দেয়। সে চায় সেই সব অনিষ্টকর জিনিসকে ধ্বংস করে দিতে ; কখনো তা ধ্বংস হয়, কখনো হয় না। তার ফলে সে উপলব্ধি করে যে, সেই সব জিনিসের আসা না-আসা, দূর হওয়া না হওয়ার উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই।

এমন অনেক কিছুই রয়েছে, যার শান-শওকত ও বৃহত্ব দেখে মানুষ ভীত হয়ে পড়ে। পাহাড়, নদী ও ভয়াবহ হিংস্র জানোয়ারের রূপ তার চোখের সামনে আসে। ঝড়ঝঞ্জা, প্লাবন ও ভূমিকম্পের নগ্নরূপ সে দেখতে পায়। মেঘের গর্জন, অন্ধকার ঘনঘটা, বজ্রের হুংকার, বিজলীর চমক ও মুষলধার-বৃষ্টির দৃশ্য একের পর এক তার চোখের সামনে আসতে থাকে। সে দেখে যে, এসব জিনিস কত বড়, কত শক্তিশালী, কত মহিমাময় আর তার তুলনায় সে নিজে কত দুর্বল কত নগণ্য !

এসব বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য ও তার নিজের দীনতার বিভিন্ন প্রমাণ চোখের সামনে দেখে মানুষের অন্তরে স্বতঃই নিজের দাসত্ব (বন্দেগী), পরমুখাপেক্ষিতা ও দুর্বলতার অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং সেই অনুভূতির সাথে সাথেই জন্মে

আল্লাহর ধারণা। যে হাতের ইংগিতে চালিত হয় এসব মহাশক্তি, তাঁর ধারণা তার মনে জাগ্রত হয়। তাঁর শক্তির অনুভূতি মানুষকে বিনয়-নম্র করে, তাঁরই কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে বাধ্য করে। তাঁর কল্যাণদায়ক শক্তির অনুভূতি মানুষকে বাধ্য করে বিপদ মুক্তির জন্য তাঁরই সামনে হস্ত প্রসারিত করতে। তার অনিষ্টকর শক্তির অনুভূতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর ভীতি অন্তরে পোষণ করতে এবং তাঁর গযব থেকে বাঁচার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে।

অজ্ঞতার সর্বনিম্ন স্তর তাকেই বলা যায়, যখন মানুষে এসব ঐশ্বর্য ও শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে ও তাদের কল্যাণকর বা অনিষ্টকর রূপ দেখে মনে করে যে, এরাই খোদা, তারা পূজা করতে থাকে জানোয়ার, পাহাড় ও নদীকে। তারা পূজা করে যমীন, আগুন, বৃষ্টি, হাওয়া, চন্দ্র, সূর্য ও আরো কত শক্তির।

যখন এ অজ্ঞতার মাত্রা কিছুটা কম থাকে এবং জ্ঞানের আলোক কিছুটা পাওয়া যায়, তখন বুঝা যায় যে, এসব জিনিস মানুষেরই মত পরমুখাপেক্ষী, কত বড় বড় জানোয়ার তুচ্ছ মশা-মাছির মত মরে যায় ; প্রকান্ড প্রকান্ড নদীর পানি ওঠে, নামে, শুকিয়ে যায়, মানুষ নিজেই কেটে ফেলে পাহাড়। যমীনের ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া তার নিজের ইচ্ছাধীন নয়, পানি যখন তাকে সাহায্য করে না, তখনই যমীন হয় শুষ্ক অনুর্বর। পানিও নিজের খুশী মত চলতে পারে না তাকেও হতে হয় হাওয়ার মুখাপেক্ষী। হাওয়াও নিজের ক্ষমতার অধীন নয়, তার কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করে অন্যবিধ কল্যাণের উপর। চন্দ্র, সূর্য, তারকাও কোন বিশেষ বিধানের আনুগত্য করে চলে। এ বিধানের বাইরে তারা কখনো তাদের গতির বিন্দুমাত্র রদবদল করতে পারে না। এসব দেখে শুনে মানুষের মন কোন অদৃশ্য রহস্যাবৃত শক্তির দিকে ফিরে যায় তখন সে ভাবতে থাকে যে, এসব দৃশ্যমান বস্তুসমূহের অন্তরালে রয়েছে এমন রহস্যাবৃত শক্তিপু , যারা পরিচালিত করছে তাদেরকে এবং সবকিছুই হচ্ছে এ শক্তিপুঞ্জের অধীন। এখান থেকেই বহু খোদা ও বহু দেবতার ধারণার উদ্ভব হয়েছে। এ অবস্থাতেই মানুষ মেনে নিয়েছে আলো, হাওয়া, পানি ব্যাধি, স্বাস্থ্য ও আরো বহু জিনিসের আলাদা আলাদা খোদার অস্তিত্ব। তাদের কাল্পনিক মূর্তি তৈরী করে তারা করে চলেছে তাদের পূজা।

এরপর যখন আরো বেশী করে জ্ঞানের আলো আসতে থাকে, তখন মানুষ দেখতে পায় যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা চলছে এক শক্তিশালী আইন ও এক বড় রকমের বিধানের অনুসরণ করে। হাওয়ার গতি, বৃষ্টির আগমন, গ্রহ-উপগ্রহের আবর্তন, ঋতুসমূহের পরিবর্তনের মধ্যে কি নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজমান ; কিভাবে অগণিত শক্তি মিলে-মিশে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বজগতের এ সামঞ্জস্য লক্ষ্য

করে একজন মুশরিককেও মেনে নিতে হচ্ছে যে, সব ছোট ছোট খোদার উপর রয়েছে সবার বড় এক খোদার সার্বভৌম আধিপত্য ; নইলে এসব ভিন্ন ভিন্ন খোদা অনন্য নির্ভরশীল ও স্বতন্ত্র হলে এবং সর্বত্র তাদের স্বেচ্ছাতন্ত্র চালিয়ে গেলে বিশ্বের এ বিপুল বিরাট কারখানা বিপর্যস্ত হয়ে যেত এই বড় খোদার নাম দিয়েছে সে 'আল্লাহ' 'পরমেশ্বর' 'খোদায়ে খোদাগান'—আরো কত কিছু। উপাসনার ক্ষেত্রে ছোট খোদাকেও শরীক করেন তাঁর সাথে। তার ধারণা আল্লাহর কর্তৃত্ব চলছে পার্থিব রাজা-বাদশাহর রাজত্বেরই মত। যেমন দুনিয়ার এক বাদশাহ রাজত্ব করেন, তাঁর থাকে বহু মন্ত্রী, বিশ্বস্ত অনুচর, শাসনকর্তা ও দায়িত্বশীল কর্মচারী, তেমনি করে এ সৃষ্টির উপর রয়েছেন এক বড় খোদা ; আর বহু ছোট ছোট খোদা রয়েছে তাঁর অধীনে। যতক্ষণ না এসব ছোট ছোট খোদাকে খুশী করা যাবে, ততক্ষণ বড় খোদার কাছে যাওয়া যাবে না। সুতরাং তাদেরও উপাসনা কর, তাদের কাছে হাত পাত, তাদের অসন্তোষের ভয় কর, তাদেরকে বড় খোদার কাছে পৌছাবার মাধ্যমে পরিণত কর এবং নযর-নিয়ায দিয়ে তাদেরকে খুশী রাখ।

আবার যখন জ্ঞানের ক্ষেত্র আরো উন্নত হতে থাকে খোদার সংখ্যা তখন আরো কমতে থাকে। অজ্ঞ মানুষেরা যত খোদা তৈরী করে রেখেছে, তার মধ্যে এক একটির চিন্তা করলে মানুষ বুঝতে পারে যে, সে খোদা-ই নয়। সে আমাদেরই মত এক বান্দাহ, বরং আমাদের চেয়েও বেশী অসহায় সে। এমনি করে একে একে এসব কাল্পনিক খোদা পরিত্যক্ত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কেবল এক খোদাই অবশিষ্ট থাকেন। কিন্তু এ এক খোদা সম্পর্কেও মানুষের ধারণায় অনেকখানি অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ ধারণা করে যে, খোদা আমাদের মত রক্ত-মাংসের দেহের অধিকারী এবং তিনি এক নির্দিষ্ট স্থানে বসে তাঁর খোদায়ী চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ মনে করে, খোদা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে মানুষেরই মত বাস করেন এবং মানুষের মত তাঁরও সন্তান-সন্ততির ধারা চলে আসছে। কেউ আবার অনুমান করে যে, খোদা মানুষের আকৃতি ধারণ করে অবতরণ করে দুনিয়ায়। কেউ বলে খোদা এ দুনিয়ার কারখানা চালু করে দিয়ে নির্বিকভাবে বসে আছেন এবং কোথাও আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছেন। কারুর ধারণা, খোদার কাছে বুযর্গ লোকদের আত্মাসমূহের সুপারিশ অপরিহার্য এবং তাদের মাধ্যম ব্যতীত সেখানে কোন কাজ চলতে পারে না। কেউ তার ধারণায় আল্লাহর এক বিশেষ রূপ পরিকল্পনা করে নেয় এবং উপাসনার জন্য সেইরূপ সম্মুখে স্থাপন করার অপরিহার্য প্রয়োজন অনুভব করে। তাওহীদ বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও এ ধরনের বহুবিধ ভুল ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে, যার ফলে মানুষ শির্‌ক অথবা কুফরে নিমজ্জিত হয়। এর সব কিছুই হচ্ছে অজ্ঞতার পরিণতি।

সবার উপরে রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কথাটির স্থান। এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা খোদ আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক যুগে তার নবীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ জ্ঞান সবার আগে তিনি হযরত আদম (আ)-কে দিয়ে তাঁকে দুনিয়ায় অবতীর্ণ করেছিলেন। আদম (আ)-এর পরে এ জ্ঞান লাভ করেছিলেন হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য সকল পয়গাম্বর। আবার এ জ্ঞান নিয়েই সবার শেষে দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। এ নির্ভুল জ্ঞানের মধ্যে কোন অজ্ঞতার স্পর্শ নেই। উপরে শির্ক, বুতপরস্তি ও কুফরের যত রূপ আমি বর্ণনা করেছি, মানুষ পয়গাম্বরদের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজস্ব উপলব্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করেছে বলেই তাতে জড়িত হয়েছে। এবার এ ছোট-খাট কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করব।

এক ঃ সবার আগে বিবেচ্য প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর ধারণা। এই সীমাহীন বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এর আদি ব্যবস্থাপনা ও অন্ত সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আমাদের মন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এক অজানা যুগ থেকে শুরু হয়েছে এর গতি এবং অজানা যুগের দিকে চলছে এগিয়ে। এর ভিতরে পয়দা হয়েছে সীমাসংখ্যাহীন অনন্ত সৃষ্টি এবং আরো পয়দা হয়ে চলছে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট এমন বিস্ময়কর যে, তা উপলব্ধি করতে গিয়ে মনুষ্য-জ্ঞান বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। এ বিপুল সৃষ্টির খোদায়ী কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব, যিনি নিজে সীমাবন্ধনহীন, অনন্তকাল ধরে যিনি জীবন্ত, যিনি কারুর মুখাপেক্ষী নন, যিনি স্বাধীন, সর্বশক্তিমান, সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ও সর্বজ্ঞ, সকল বস্তুর জ্ঞান যিনি রাখেন, কোন কিছুই যাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে না, সবার উপর যিনি বিজয়ী এবং যাঁর হুকুম অমান্য করতে কেউ পারে না, যিনি অনন্ত শক্তির মালিক এবং আপনা থেকেই যাঁর কাছ থেকে সৃষ্টির সকল জীবের কাছে পৌঁছে জীবন ও জীবিকার সামগ্রী, যিনি সকল অভাব, ত্রুটি ও দুর্বলতা দোষ থেকে মুক্ত এবং যাঁর কার্যে অপর কারুর হস্তক্ষেপ চলতে পারে না।

দুই ঃ আল্লাহর কর্তৃত্বের এসব গুণ কেবল একটি মাত্র সত্তার ভিতরে সীমাবদ্ধ হওয়াই অপরিহার্য। একাধিক সত্তার মধ্যে এসব গুণের অস্তিত্ব সমভাবে থাকা অসম্ভব, কারণ সবার উপর বিজয়ী ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী মাত্র একজনই হতে পারেন। এসব গুণরাজী ভাগাভাগী করে বহু খোদার মধ্যে বন্টন করে নেয়াও তেমনি অসম্ভব। কেননা এক খোদা যদি হন সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, অপর এক খোদা সর্বজ্ঞ, অপর একজন হন জীবন দানকারী তা হলে প্রত্যেক খোদাকে হতে হয় অপরের মুখাপেক্ষী এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা না থাকলে মুহূর্তে এ সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। এও সম্ভব হতে

পারে না যে, এসব গুণরাজী এক থেকে অপরের কাছে ন্যস্ত হবে অর্থাৎ এর কোন গুণ কখনো থাকবে এক খোদার মধ্যে; আবার কখনো থাকবে অপর খোদার মধ্যে; কেননা যে খোদা নিজেকে জীবন্ত রাখার মতো ক্ষমতার অধিকারী নয়, সারা সৃষ্টিকে জীবন দান করা তার পক্ষে অসম্ভব এবং যে খোদা নিজের খোদায়ী সংরক্ষণ করতে পারে না, এত বড় বিরাট সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয় ; সুতরাং যত বেশী করে জ্ঞানের দীপ্তি লাভ করা যাবে মনে তত বেশী প্রত্যয় জন্মাবে যে, কেবলমাত্র একই সত্তার মধ্যে আল্লাহর গুণরাজীর সমাবেশ হওয়া অপরিহার্য।

তিন ঃ আল্লাহর কর্তৃত্বের পরিপূর্ণ ও নির্ভুল ধারণাকে দৃষ্টির সামনে রেখে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। যত সব জিনিস দৃষ্টি পথে আসে, যা কিছু জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসে, তার কোন কিছুর মধ্যেই এসব গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশ্ব-প্রকৃতির সবকিছু অপরের মুখাপেক্ষী ও অপর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ; তারা জন্মে, পরিবর্তিত হয়, মরে ও বাঁচে। কোনকিছুই এক অপরিবর্তিত অবস্থায় স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। কারুরই নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কিছু করার ক্ষমতা নেই। সর্বোপরি যে আইন বলবৎ রয়েছে, তার চুল পরিমাণ অতিক্রম করার ক্ষমতা কারুর নেই। তাদের অবস্থা থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ নয়। কারুর মধ্যে আল্লাহর সামান্যতম দ্যুতিও দেখা যায় না। আল্লাহর কার্যকলাপের মধ্যে তাদের কারুর বিন্দুমাত্র দখল নেই।। লা-ইলাহা-র মানে হচ্ছে এই।

চার ঃ বিশ্ব-জগতের সকল পদার্থের আল্লাহর কর্তৃত্ব অস্বীকার করার পর একথা অংগীকার করতেই হবে যে, সর্বোপরি রয়েছেন আর এক স্বতন্ত্র সত্তা। একমাত্র তিনিই হচ্ছেন সকল কর্তৃত্বের গুণরাজীর অধিকারী এবং তিনি ব্যতীত আর কোন আল্লাহ নেই। ইল্লাল্লাহ-র মানে হচ্ছে এই।

সকল জ্ঞানের সেরা জ্ঞান হচ্ছে এই। যতই অনুসন্ধান ও গবেষণা চালানো যাবে, ততই বুঝতে পারা যাবে যে, জ্ঞানের শুরু এখানেই এবং শেষ সীমানাও এতেই সীমাবদ্ধ। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মানবীয় তত্ত্ব—এক কথায় বিশ্ব-জগতের রহস্য অনুসন্ধানের যে কোন পথই অবলম্বন করা হবে, সেখানে গবেষণা চালিয়ে অগ্রসর হতে হতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সত্যতা ক্রমাগত উদঘাটিত হতে থাকবে এবং তার প্রতি প্রত্যয় ক্রমাগত বেড়ে যাবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতি পদে অনুভূত হবে যে, সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ সত্যকে অস্বীকার করার পর সৃষ্টির যে কোন জিনিস নিরর্থক হয়ে যায়।

মানব জীবনে তাওহীদ বিশ্বাসের প্রভাব

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র স্বীকৃতি ঘোষণা করলে তার ফলে মানব জীবনে কি প্রভাব পড়ে এবং এ কালেমা অমান্যকারী দুনিয়া ও আখেরাতে কেন ব্যর্থ হয়, তার বর্ণনা এখানে পেশ করছি।

এক ঃ এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন হতে পারে না। সে এমন এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী যিনি যমীন ও আসমানের স্রষ্টা, মাশরিক ও মাগরিবের মালিক, তামাম জাহানের পালনকর্তা। এ ঈমানের পর সারা সৃষ্টির কোন বস্তুই তার দৃষ্টিতে নিজের থেকে আলাদা মনে হতে পারে না। আপন সত্তার মতই সে এর সবকিছুকে একই মালিকের আধিপত্যের ও একই বাদশাহর প্রভুত্বের অধীন মনে করে। তার সহানুভূতি, প্রেম ও খেদমত কোন বিশেষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। আল্লাহর বাদশাহী যেমন অনন্ত-অসীম, তার দৃষ্টিভংগীও তেমনি সীমা-বন্ধনহীন হয়ে যায়। এ ধরনের দৃষ্টিভংগি এমন কোন লোকের মধ্যে থাকতে পারে না, যে ছোট ছোট খোদার বহু অস্তিত্ব স্বীকার করে অথচ যার খোদার মধ্যে মানুষেরই মত সীমাবদ্ধ ও ক্রটি-বিচ্যুতিপূর্ণ গুণের সমাবেশ হয়, অথবা যে ব্যক্তি গোড়া থেকেই খোদার অস্তিত্বই স্বীকার করে না।

দুই ঃ এ কালেমা মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এর উপর বিশ্বাসপোষণকারী জানে যে, এক আল্লাহ-ই সকল শক্তির মালিক। তিনি ব্যতীত আর কেহ মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ দান করতে পারে না, কেউ তাকে জীবন দিতে পারে না, মারতে পারে না, এ জ্ঞান ও প্রত্যয় তাকে আল্লাহ ব্যতীত অপর যে কোন শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত, আত্মনির্ভরশীল ও নির্ভীক করে তোলে। তার শির কোন সৃষ্টির সামনে অবনমিত হয় না ; তার হাত কারুর সামনে প্রসারিত হয় না। তার অন্তরে কারুর শ্রেষ্ঠত্বের আধিপত্য স্থান লাভ করে না। তাওহীদ বিশ্বাস ব্যতীত কোন অন্যবিধ বিশ্বাস থেকে এ গুণের জন্ম হয় না। শির্ক কুফর ও নাস্তিকতার অপরিহার্য প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, মানুষ তার প্রভাবে সৃষ্টির সামনে অবনমিত হয়। তাকেই কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মনে করে, তারই ভয় সে অন্তরে পোষণ করে এবং তার কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করে।

তিন ঃ আত্মসম্মানবোধের সাথে সাথে এ কালেমা মানুষের মধ্যে বিনয়ও সৃষ্টি করে। এ কালেমার স্বীকৃতিদানকারী কখনো গর্বস্ফীত ও উদ্ধত হতে পারে না। শক্তির গর্ব, সম্পদের গর্ব ও যোগ্যতার গর্ব কখনো তার মনে স্থান লাভ করে না, কারণ সে জানে তার যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর দান এবং তিনি

যেমন সবকিছু দেয়ার শক্তি রাখেন, তেমনি সবকিছু নেয়ার শক্তিও তাঁরই রয়েছে। এর মুকাবিলায় এমন লোকও রয়েছে যে কোনরূপ পার্থিব কৃতিত্ব অর্জন করে গর্বস্ফীত হয়ে ওঠে। কারণ সে মনে করে যে, তার সে কৃতিত্ব তার যোগ্যতার ফল। এমনি করে শির্ক ও কুফরের সাথে অহংকারের উদ্ভব অপরিহার্য, কেননা মুশরিক ও কাফের ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, তাদের উপাস্য বহু খোদা ও দেবতার সাথে তাদের রয়েছে একটা বিশেষ সম্পর্ক, যা অপরের ভাগ্যে জোটে না।

চার ঃ এ কালেমায় বিশ্বাস পোষণকারী বেশ ভাল করেই জানে, আত্মার শুদ্ধি ও সৎকর্ম ব্যতীত তার মুক্তি ও সাফল্যের আর কোন পথ নেই। কারণ সে এমন এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস পোষণ করে যিনি আত্মনির্ভরশীল, কারুর সাথে যাঁর কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই, যিনি পূর্ণ ন্যায় বিচারক, যাঁর কর্তৃত্বতে আর কারুর হস্তক্ষেপ বা প্রভাব চলতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা মুশরিক ও কাফের তাদেরকে সর্বক্ষণ মিথ্যা আশার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ মনে করে যে, খোদ খোদার পুত্র তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। কেউ মনে করে সে খোদার অনুগৃহীত সুতরাং তার কোন শাস্তি হতে পারে না। কারুর ধারণা তাদের বুযর্গেরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। কেউ আবার দেবতাকে নযর-নিয়ায দিয়ে ভাবছে, দুনিয়ার বুকে সবকিছু করার স্বাধীনতা সে পেয়েছে। এ ধরনের মিথ্যা বিশ্বাস তাকে সর্বক্ষণ পাপ ও দুষ্কৃতির চক্রে টেনে নিয়ে যায় এবং সেই মিথ্যা বিশ্বাসের উপর ভরসা করে সে আত্মশুদ্ধি ও সৎকর্ম থেকে গাফেল হয়ে থাকে। নাস্তিক ব্যক্তির ব্যাপারে বলা যায়, সে তো শুরু থেকেই এমন কোন শক্তিমান সত্তায় বিশ্বাস করে না ভাল মন্দ কাজের জন্য যার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে দুনিয়ায় নিজেকে মনে করে যে কোন কাজ করার স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। এ ধরনের লোকের অন্তরের আকাংখাই হয় তাদের খোদা এবং তারা হয় ইন্দ্রীয়পরতার দাস।

পাঁচ ঃ এ কালেমার স্বীকৃতীদানকারী কোন অবস্থায়ই হতাশ ও ভগ্ন হৃদয় হয় না। সে এমন এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, যিনি আসমান যমীনের সকল ধনভান্ডারের মালিক, যার মহিমা ও অনুগ্রহ সীমাহীন এবং যাঁর শক্তি অনন্ত। এ ঈমান তাকে দেয় অসাধারণ শান্তি ও নিশ্চিন্ততা এবং তার অন্তরকে আশায় পরিপূর্ণ করে। দুনিয়ার সকল দুয়ার থেকে সে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরতে পারে, কোন কিছুই তার কাছে না আসতে পারে এবং সকল উপায় ও পন্থা সে একে একে হারাতে পারে, তথাপি এক আল্লাহর উপর নির্ভর-প্রবণতা সে কোন অবস্থায়ই হারায় না এবং তারই বলে সে নতুন আশা বুকে নিয়ে নতুন প্রচেষ্টায়

আত্মনিয়োগ করে। এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস ব্যতীত অপর কোন বিশ্বাস থেকেই অন্তরের এ নিশ্চিন্ততা লাভ করা যেতে পারে না। মুশ্‌রিক, কাফের ও নাস্তিক যারা তাদের অন্তর ছোট হয়ে থাকে, তাদেরকে নির্ভর করতে হয় সীমাবদ্ধ শক্তির উপর। তাই সংকটের পথে, দ্রুত তাদেরকে ঘিরে ফেলে হতাশা এবং অনেক সময়ে এমনি অবস্থায় তাদেরকে আত্মহত্যার পথ ধরতে হয়।

ছয় ঃ এ কালেমার উপর বিশ্বাস মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে দৃঢ় সংকল্প, উচ্চাকাঙ্খা, অধ্যবসায় ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বিপুল শক্তি। আল্লাহর সন্তোষ বিধানের জন্য যখন সে কোন মহৎ কাজ করার পথে এগিয়ে যায় তখন অন্তরে প্রত্যয় পোষণ করে যে, যমীন ও আসমানের বাদশাহর শক্তি রয়েছে তার পশ্চাতে। এ ধারণা তার ভিতরে পর্বতের দৃঢ়তা সৃষ্টি করে দেয় এবং দুনিয়ার সকল সংকট, বিপদ বিরোধী শক্তিসমূহ মিলিত হলেও তাকে তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। শির্‌ক, কুফর ও নাস্তিকতায় এ শক্তি কোথায় পাওয়া যাবে?

সাত ঃ এ কালেমা মানুষকে বীর্যবান করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে মানুষকে কাপুরুষ করে তোলে দু'টো জিনিস ঃ একদিকে ধন-প্রাণ ও সন্তান-সন্তুতির প্রেম, অপরদিকে এ ধারণা যে, আল্লাহ ব্যতীত মানুষের মৃত্যু ঘটাবার মত অপর কোন শক্তি রয়েছে এবং মানুষ চেষ্টা করে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস এ দু'টো জিনিসকে অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। প্রথমটি দূরিভূত হওয়ার কারণ, এ কালেমায় স্বীকৃতিদানকারী নিজের ধন-প্রাণ ও সবকিছুর মালিক বলে জানে একমাত্র আল্লাহকেই এবং সে আল্লাহর সন্তোষের জন্য সবকিছু কুরবান করতে তৈরী থাকে। তারপর দ্বিতীয় ধারণাটিও তার অন্তরে অবশিষ্ট থাকে না, কারণ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার স্বীকৃতিদানকারীর দৃষ্টিতে প্রাণ হরণের ক্ষমতা মানুষ, পশু, তোপ, তলোয়ার, লাঠি, পাথর কোন কিছুরই নেই, এ ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ এবং তিনি মৃত্যুর যে সময় নির্দেশ করে রেখেছেন, তার আগে দুনিয়ার সকল শক্তি মিলিত হয়েও কারুর প্রাণ হরণ করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারীর চেয়ে বেশী বীর্যবান ও সাহসী দুনিয়ার আর কেউ হতে পারে না। নাংগা তলোয়ারের চমক, কামানের অগ্নিবর্ষণ, বোমাবৃষ্টি ও দুর্দান্ত সেনাবাহিনীর আক্রমণ সবকিছুই তার কাছে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। আল্লাহর পথে যখন সে লড়াই করতে এগিয়ে যায় তখন তার চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। মুশ্‌রিক, কাফের ও নাস্তিক এ শক্তি পাবে কোত্থেকে? তাদের কাছে প্রাণই সবচেয়ে

প্রিয় বস্তু এবং তারা মনে করে, দুশমনই নিয়ে আসে মৃত্যু ; আর দুশমনকে সরিয়ে দিতে পারলেই মৃত্যুকেও সরিয়ে দেয়া যায়।

আট ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস মানুষের মনে সন্তোষ, পরিতুষ্টি ও অনন্যনির্ভরতার গৌরবময় মনোভাব সৃষ্টি করে এবং লোভ, লালসা, হিংসা ও বিদ্বেষের অবাঞ্ছিত মনোভাব তার অন্তর থেকে দূরীভূত করে দেয়। সাফল্য অর্জনের অবৈধ ও ঘৃণ্য ধারণা তার মনে অনুপ্রবেশের অবকাশই পায় না। সে মনে করে যে, রুযী-রোযগার আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা বেশী করে দেন, যাকে ইচ্ছা কম কের দেন। সম্মান, শক্তি, খ্যাতি ও আধিপত্য আল্লাহর ইখতিয়ারের অন্তর্গত; তিনি আপন বিবেচনা অনুযায়ী যাকে যেমন ইচ্ছা কম করে দেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজ নিজ সীমানার মধ্যে বৈধ উপায়ে চেষ্টা করে যাওয়া। সাফল্য ও ব্যর্থতা আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। তিনি দিতে চাইলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁকে বাধা দিতে পারে না আর তিনি দিতে না চাইলে কোন শক্তিই তাঁকে বাধ্য করতে পারে না। পক্ষান্তরে মুশ্‌রিক, কাফের ও নাস্তিকেরা নিজস্ব সাফল্য ও ব্যর্থতাকে নিজস্ব প্রচেষ্টা ও পার্থিব শক্তিসমূহের সাহায্য অথবা বিরোধিতার উপর নির্ভরশীল মনে করে এবং সেই কারণেই তারা থাকে প্রলোভন ও হিংসাবৃত্তির দাস হয়ে। তাই সাফল্য লাভের জন্য ঘুষ, খোশামোদ, ষড়যন্ত্র ও সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করতে তাদের কোন ভয় নেই। অপরের সাফল্যে তারা পরশ্রীকাতরতা ও প্রতিহিংসায় জ্বলে মরে এবং তাকে-তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার ব্যাপারে কোন রকম চেষ্টার ত্রুটি করে না।

নয় ঃ সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর আইনের অনুসারী করে তোলে। এ কালেমার প্রতি ঈমান পোষণকারী বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ প্রকাশ্য ও গাপন বস্তু সম্পর্কে অবগত আছেন, তিনি আমাদের শাহ্‌রগ অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। রাতের অন্ধকারে অথচ নিঃসংগ নির্জনতায় যদি আমরা কোন পাপের কাজ করি, তা তিনি জানতে পান। আমাদের অন্তরের গভীরে যদি কোন অসদাকাঙক্ষা জন্ম নেয়, তার খবরও আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। আর সবার কাছে আমরা যা গোপন করতে পারি, আল্লাহর কাছে তা আমরা গোপন করতে পারি না। সবার কাছ থেকে আমরা পালিয়ে বাঁচতে পারলেও আল্লাহর রাজ্যের বাইরে আত্মগোপণ করার সাধ্য আমাদের নেই। সবার কাছ থেকে বাঁচতে পারলেও আল্লাহর হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারি না। এ প্রত্যয় যত বেশী শক্তিশালী হবে, মানুষ তত বেশী আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুগত হবে। যা কিছু আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করে দিয়েছেন, তা তার কাছে ঘেষতে পারবে না। আর যা কিছু করার হুকুম করে তিনি দিয়েছেন, সে নিঃসংগতা ও অন্ধকারের মধ্যেও

তা পালন করবে। কেননা সে জানে, এমন এক পুলিশ তার পেছনে রয়েছে, যে কখনো কোন অবস্থায় তাকে একা ছেড়ে দেবে না এবং এমন এক আদালতের ভীতি তার রয়েছে যার ওয়ারেন্ট এড়িয়ে সে কোথাও পালাতে পারে না। এ কারণেই মুসলিম হওয়ার সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে জরুরী শর্ত হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উপর ঈমান আনা। আগেই যেমন বলা হয়েছে যে, মুসলিম মানে হচ্ছে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হওয়া, তেমনি আল্লাহর অনুগত হওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না মানুষ এ প্রত্যয় পোষণ করে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন 'ইলাহ' নেই।

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী জিনিস হচ্ছে আল্লাহর উপর এ ঈমান। এ হচ্ছে ইসলামের কেন্দ্র ও মূল এবং তার শক্তির উৎস। এ ছাড়া ইসলামের যেসব বিশ্বাস, আদেশ ও বিধান রয়েছে, সবকিছুই দাঁড়িয়ে আছে এরই উপর নির্ভর করে এবং সব কিছুকেই শক্তি সংগ্রহ করতে হয় এ একই কেন্দ্র থেকে। এ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে বাদ দিলে এ ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর নবী করীম (সা) আমাদেরকে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান পোষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এ শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে তাওহীদের বিশ্বাস শিরকের যাবতীয় বিপদ সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে।

উপরে বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা খোদায়ীতে দু'রকমের সৃষ্টিকে শরীক করে নিয়েছে। এ দ্বিবিধ সৃষ্টির মধ্যে একটি হচ্ছে বাস্তব অস্তিত্বশীল ও দৃশ্যমান, যেমন ঃ চন্দ্র, সূর্য, তারকা, অগ্নি, পানি বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষ প্রভৃতি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেই ধরনের সৃষ্টি, যাদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, যারা অদৃশ্য এবং পিছনে থেকে সৃষ্টির যাবতীয় শক্তিকে পরিচালিত করে, বিশ্বাস করা হয় ঃ যেমন, একজন হাওয়া পরিচালনা করে, একজন বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করে, অপর একজন দান করে আলো। এর ভিতরে প্রথমোক্ত ধরনের সৃষ্টি তো মানুষের চোখের সামনেই রয়েছে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাণীই প্রমাণ করে দেয় যে, আল্লাহর কর্তত্বে তাদের কোন অংশ নেই। দ্বিতীয় ধরনের সৃষ্টি হচ্ছে মানব চক্ষুর অন্তরালে রহস্যাবৃত এবং মুশরিকদের এদের উপর বিশ্বাস পোষণের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। তারা এসব জিনিসকে মনে করে দেবতা, খোদা ও খোদার সন্তান-সন্ততি। এদের কল্পিত মূর্তি তৈরী করে তারা তাদের সামনে হাযির করে কত নযর-নিয়ায। সুতরাং আল্লাহর একত্বের ধারণাকে এ দ্বিতীয় ধরনের শির্ক থেকে মুক্ত রাখার জন্য বিশ্বাসের একটি স্বতন্ত্র ধারা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, যেসব রহস্যাবৃত জ্যোতির্ময় সত্তাকে মানুষ দেবতা, খোদা ও খোদার সন্তান-সন্ততি বলে থাকে প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে আল্লাহর ফেরেশতা। আল্লাহর কর্তৃত্বে তাদের কোন দখল নেই। তারা সবাই আল্লাহর ফরমানের অনুগত এবং তারা এতটা বাধ্য যে, আল্লাহর হুকুমের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তারা করতে পারে না। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে নিজের রাজ্য পরিচালনা করেন এবং তারা ঠিক আল্লাহর হুকুম মুতাবিক কাজ করে যায়। নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীন ক্ষমতা বলে কিছুই করার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা আপন ক্ষমতাবলে আল্লাহর নিকট কোন পরিকল্পনা পেশ করতে পারে না। আল্লাহর দরবারে কারুর জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদের পূজা ও তাদের সাহায্য ভিক্ষা করা মানুষের পক্ষে অপমানকর ; কেননা 'রোযে আযল' বা সৃষ্টির দিনে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বাধ্য করেছিলেন হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করতে ; আদম (আ)-কে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞান দান করেছিলেন। এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে আদম (আ)-কে যমীনের খিলাফত দান করেছিলেন। মানুষকে যে ফেরেশতাকুল সিজদা করেছিল তাদেরকে সিজদা করার ও তাদেরই কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে বড় অপমানকর ব্যাপার মানুষের পক্ষে আর কি হতে পারে ?

হযরত মুহাম্মাদ (সা) একদিকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ফেরেশতাদেরকে পূজা করতে ও তাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করতে। তিনি আমাদেরকে আরো বলেছেন যে, ফেরেশতা আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত সৃষ্টি। তাঁরা সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে মুক্ত। তাঁদের প্রকৃতি এমন যে, তাঁরা আল্লাহর আদেশসমূহ অমান্য করতে পারে না। তাঁরা সর্বক্ষণ আল্লাহর বন্দেগী ও ইবাদাতে মশগুল থাকেন। তাঁদের মধ্যে একজন মনোনীত ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তার পয়গাম্বরদের কাছে ওহী প্রেরণ করেন, তাঁর নাম হচ্ছে জিবরাঈল (আ)। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর কাছে কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে। এ ফেরেশতাদের মধ্যে এক শ্রেণী সর্বদা আমাদের সাথে লেগে আছেন প্রতি মুহূর্তে। ভাল-মন্দ গতিবিধি পরীক্ষা করছেন ; আমাদের ভালমন্দ প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের রেকর্ড সংরক্ষিত হচ্ছে। মৃত্যুর পর যখন আমরা আল্লাহর কাছে হাযির হব, তখন তারা আমাদের আমলনামা পেশ করবে এবং আমরা দেখতে পাব যে, জীবনভর গোপনে ও প্রকাশ্যে যা কিছু সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম করেছি তার সবকিছুই সংরক্ষিত রয়েছে।

ফেরেশতাদের স্বরূপ আমাদের জানান হয়নি। কেবলমাত্র তাঁদের গুণরাজী আমাদেরকে বলা হয়েছে। তাঁদের অস্তিত্বের উপর প্রত্যয় পোষণের আদেশ

দেয়া হয়েছে। তাঁরা কেমন ও কেমন নয়, তা জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। সুতরাং নিজস্ব বুদ্ধিতে তাদের সত্তা সম্পর্কে কোন মনগড়া কথা তৈরী করে নেয়া মূর্খতা মাত্র ! আবার তাঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে কুফরী। কেননা অস্বীকার করার মত কোন দলীল কারুর কাছে নেই এবং অস্বীকৃতির মানে হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। আমরা তাঁদের অস্তিত্বের উপর ঈমান পোষণ করি কেবলমাত্র এ কারণে যে, আল্লাহ তা'য়ালার সত্যিকার রাসূল আমাদেরকে দিয়েছেন তাদের অস্তিত্বের খবর।

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে তৃতীয় যে জিনিসটির প্রতি ঈমান পোষণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাবসমূহ যা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর নবীদের উপর।

আল্লাহ তা'য়ালা যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুরআন নাযিল করেছেন, তেমনি করে তাঁর আগে যেসব রাসূল অতীত হয়ে গেছেন, তাঁদের কাছেও তিনি তাঁর কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছিলেন। তার মধ্যে কোন কোন কিতাবের নাম আমাদেরকে বলা হয়েছে, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে প্রেরিত ছুহুফে ইবরাহীম (ইবরাহীমের গ্রন্থরাজি), হযরত মূসা (আ)-এর কাছে প্রেরিত তাওরাত, হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে অবতীর্ণ যবুর এবং হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে প্রেরিত ইঞ্জিল। এ ছাড়াও অন্যান্য কিতাব বিভিন্ন নবীর কাছে এসেছে, কিন্তু তার নাম আমাদেরকে বলে দেয়া হয়নি। এ কারণে অপর কোন ধর্মীয় কিতাব সম্পর্কে আমরা প্রত্যয় সহকারে বলতে পারি না যে, তা আল্লাহরই তরফ থেকে এসেছে তেমনি আবার একথাও বলতে পারি না যে, তা আল্লাহর তরফ থেকে আসেনি। অবশ্য আমরা ঈমান পোষণ করি যে, যে কিতাবই আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে, তার সবই পূর্ণ সত্যাশ্রিত ছিল।

যেসব কিতাবের কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে, তার মধ্যে ছুহুফে ইবরাহীমের অস্তিত্বই দুনিয়ায় নেই। তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদের নিকিট অবশ্য রয়েছে, কিন্তু কুরআন শরীফে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, এসব কিতাবে মানুষ আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে এবং নিজেদের তরফ থেকে অনেক কথাই তার মধ্যে মিশিয়ে ফেলেছে। ঈসায়ী ও ইয়াহুদীরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, আসল কিতাবগুলো কাছে নেই, রয়েছে কেবল তার তরজমা এবং তাতেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এসব কিতাব পড়লেও পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, তার মধ্যে এমন বহু কথা রয়েছে, যা আল্লাহর তরফ

থেকে কখনো আসতে পারে না। এ কারণে যেসব কিতাব বর্তমান রয়েছে তা ঠিক আল্লাহর কিতাব নয় ; তার মধ্যে আল্লাহর কালাম ও মানুষের কালাম মিলেমিশে গেছে এবং কোন্‌টি আল্লাহর কালাম ও কোন্‌টি মানুষের কালাম তা বুঝবারও কোন উপায় নেই। সুতরাং অতীতের কিতাবসমূহের উপর ঈমান পোষণের যে হুকুম আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তার ধরন হচ্ছে কেবল এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মজীদের আগেও দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির কাছে তাঁর আদেশসমূহ আপন নবীদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন এবং যে আল্লাহর কাছ থেকে কুরআন এসেছে, সেই একই আল্লাহর কাছ থেকেই সেই সব কিতাবও তাঁর হুকুমসমূহ নিয়ে এসেছিল। কুরআন কোন নতুন ও অভিনব কিতাব নয়, বরং অতীতের সেই শিক্ষাকে জীবন্ত করার জন্যই তা প্রেরিত হয়েছে, যে শিক্ষা অতীত যুগের লোকেরা পেয়ে বিনষ্ট করে ফেলেছে অথবা পরিবর্তন করেছে অথবা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত কথার সাথে মিশিয়ে ফেলেছে।

কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'য়ালার আখেরী কিতাব। কতকগুলি দিক দিয়ে তার অতীতের কিতাবসমূহের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ঃ

এক ঃ পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলোর অধিকাংশের আসল লিপি দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, রয়ে গেছে কেবলমাত্র সেগুলোর অনুবাদ। কিন্তু কুরআন যেসব শব্দ সম্বলিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা এখনো পুরোপুরি অক্ষুণ্ন রয়েছে, তার একটিমাত্র বর্ণ এমন কি একটি বিন্দু পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি !

দুই ঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে মানুষ কালামে ইলাহীর সাথে নিজস্ব কালাম মিশ্রিত করে ফেলেছে। একই কিতাবে আল্লাহর কালাম রয়েছে, জাতীয় ইতিহাস রয়েছে, বুযর্গদের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে, ব্যাখ্যা রয়েছে, বিধান-কর্তাদের উদ্ভাবিত বিধান সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা রয়েছে, এবং এর সবকিছুই এমনভাবে সংমিশ্রিত হয়ে আছে যে, আল্লাহর কালাম তার ভিতর থেকে আলাদা বাছাই করে নেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কুরআনে আমরা পাই নিছক আল্লাহর কালাম এবং তার মধ্যে অপর কারুর কথার বিন্দুমাত্র সংমিশ্রণ ঘটেনি। তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্, সিরাতে রাসূল, সীরাতে সাহাবা, ইতিহাস—ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানগণ যা কিছু লিখেছেন, তা সবই কুরআন থেকে আলাদা বিভিন্ন গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুরআন মজীদে তার একটি শব্দও মিশ্রিত হতে পারেনি।

তিন ঃ দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির কাছে যেসব কিতাব রয়েছে, তার মধ্যে একখানি কিতাব সম্পর্কেও ঐতিহাসিক দলীল দ্বারা প্রমাণ করা চলে না, তা যে নবীর প্রতি আরোপ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁরই মাধ্যমে তা নাযিল হয়েছিল।

বরং বিভিন্ন ধর্মীয় কিতাব এমনও রয়েছে, যার সম্পর্কে গোড়া থেকে বুঝা যায়নি কোন্ যামানায় কোন নবীর উপর তা অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু কুরআন সম্পর্কে এমন বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে যে, কোন ব্যক্তিই হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে তার যোগাযোগ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। এমন কি, তার আয়াতসমূহ সম্পর্কে কোন্ আয়াত কখন কোথায় নাযিল হয়েছিল, তাও সঠিকভাবে জানা যায়।

চার ঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যেসব ভাষায় নাযিল হয়েছিল, বহুকাল ধরে তা মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় কোথাও সে ভাষায় কথা বলবার লোক অবশিষ্ট নেই এবং তা বুঝবার লোকও খুব কমই পাওয়া যায়। এ ধরনের কিতাব যদি অবিকৃত ও নির্ভুল অবস্থায়ও পাওয়া যেত তথাপি তার বিধানসমূহ সঠিকভাবে বুঝা ও তার অনুসরণ করা সম্ভব হত না। অথচ কুরআন যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা হচ্ছে একটি জীবন্ত ভাষা। দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ আজো এ ভাষায় কথা বলছে, কোটি কোটি মানুষ এ ভাষা জানে ও বুঝে। এর শিক্ষার ধারা দুনিয়ার সর্বত্র জারী রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এ ভাষা শিখতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি এ ভাষা শিখবার অবকাশ না পায়, প্রত্যেক জায়গায় সে এমন সব লোকের সন্ধান পেতে পারে, যাঁরা তাকে কুরআন শরীফের অর্থ বুঝিয়ে দেবার যোগ্যতা রাখেন।

পাঁচ ঃ দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির কাছে যেসব ধর্মীয় কিতাব রয়েছে, তার প্রত্যেক কিতাবে সন্নিবেশিত আদেশসমূহ দেখে বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র এক বিশেষ যুগের অবস্থা বিবেচনায় তখনকার প্রয়োজন মিটাবার জন্যই তা প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার প্রয়োজন নেই অথবা তার অনুসরণ করে কাজ করা যায় না। এদ্বারা একটা সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এসব কিতাব ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এর কোন কিতাবই তামাম দুনিয়ার জন্য আসেনি। আবার যে জাতির জন্য সেই কিতাব এসেছিল তাদের জন্যও তা সর্বকালে প্রযোজ্য হয়ে আসেনি, বরং তা এসেছিল, একটি বিশেষ যামানার জন্য। এবার কুরআনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে এ কিতাবের সর্বত্র সাধারণভাবে মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর কোন একটি ধারা দেখেও এমন সন্দেহ হবে না যে, তা কোন বিশেষ জাতির উদ্দেশ্যে এসেছে। অনুরূপভাবে এ কিতাবে যেসব বিধান রয়েছে, তা সর্বকালে সর্বত্র কার্যকরী করা যেতে পারে। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন সারা দুনিয়ায় সর্বকালে প্রয়োজন।

ছয় ঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রত্যেকটিতেই সৎকর্ম ও ন্যায়-নীতির কথা বর্ণনা করা হয়েছিল এবং চরিত্র, নৈতিকতা, সততা ও সত্যনিষ্ঠার নীতিসমূহ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেকটি কিতাবেই আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী

জীবন যাপন করার পথ নির্দেশ করা হয়েছিল, একথা সত্যিই, কিন্তু কোন কিতাবই এমন ছিল না, যাতে কোন কিছু বাদ না দিয়ে সকল গুণের সমাবেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আলাদা আলাদা করে যেসব গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল, একমাত্র কুরআনেই তার সকল কিছুর সমাবেশ হয়েছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যেসব কথা বাদ পড়ে গিয়েছিল, তাও এ কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সকল ধর্মীয় কিতাবে মানুষের কৃত হস্তক্ষেপ ও বিকৃতির দরুন এমন সব কথা মিশ্রিত হয়ে গেছে, যা বাস্তব সত্যের বিপরীত ও যুক্তি বিরোধী এবং যুলুম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের বিশ্বাস ও কার্যকলাপ তার ফলে বিকৃতিদুষ্ট হয়ে যায়। এমন কি, অনেক কিতাবে অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কথাও দেখা যায়। কুরআন এসব বিকৃতি থেকে মুক্ত। তার মধ্যে এমন কোন কথা নেই, যা যুক্তি বিরোধী এবং যা প্রামাণ্য দলীল ও পরীক্ষা দ্বারা ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে। এর কোন হুকুম অবিচারের সংস্পর্শ নেই, এর কোন কথাই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং এর ভিতরে অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কথার নাম নিশানা নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারা কুরআন শরীফ উচ্চাংগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি, ন্যায় বিচারের শিক্ষা, সঠিক পথের নির্দেশ এবং সর্বোত্তম বিধান ও আইন পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের দরুন তামাম দুনিয়ার জাতিসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন কুরআনের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং অপর সকল কিতাবকে ছেড়ে একমাত্র এ কিতাবেরই অনুসরণ করে। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য মানুষের যেরূপ পথ নির্দেশের প্রয়োজন তার সবকিছুই এর মধ্যে পরিপূর্ণ ও নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পর আর কোন কিতাবের প্রয়োজন নেই।

কুরআন ও অন্যান্য কিতাবের মধ্যে তফাত কি তা যখন জানা হয়ে গেল তখন প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমানের ক্ষেত্রে কতটা পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান কেবল তার সত্যতা স্বীকারের সীমানা পর্যন্ত থাকবে, অর্থাৎ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, সেই সব কিতাবও আল্লাহর তরফ থেকে এসেছিল, সত্যাশ্রিত ছিল এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে, সেই একই উদ্দেশ্যে সেই সব কিতাব এসেছে। কুরআনের উপর ঈমান এ ধরনের হবে যে, এ হচ্ছে আল্লাহর বিশুদ্ধ কালাম, পরিপূর্ণ সত্যের বাহন, এর প্রতিটি শব্দ সুরক্ষিত, এর প্রতিটি উক্তি সত্য, এর প্রতিটি আদেশের অনুসরণ করা ফরয। কুরআন বিরোধী যে কোন জিনিসই অগ্রাহ্য করতে হবে।

আল্লাহর রাসূলদের প্রতি ঈমান

কিতাবসমূহের পর আল্লাহর সকল রাসূলের উপর ঈমান পোষণ করার নির্দেশও আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সকল কওমের মধ্যে আল্লাহর রাসূল এসেছিলেন এবং সর্বশেষ হযরত মুহাম্মাদ (সা) ইসলামের যে শিক্ষা দেয়ার জন্য দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন, তাঁরাও সেই এক শিক্ষাই দিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে আল্লাহর সকল রাসূলই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে কোন একজন বিশেষ রাসূলকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করলে তার ফলে সকলকেই মিথ্যা ঘোষণা করা হয়। এবং অনুরূপভাবে কোন একজন রাসূলের সত্যতা স্বীকার করলে তার পক্ষে সকলেরই সত্যতা স্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করা যেতে পারে, দশজন লোক একই কথা বলছেন। তাদের মধ্যে একজনকে সত্যভাষী বলে স্বীকার করে নিলে আপনা থেকেই বাকী নয়জনকে সত্যভাষী বলে স্বীকার করা হয়ে যায়। যদি একজনকে মিথ্যাবাদী বলা হয়, তাহলে তার মানে হচ্ছে, তাদের কথিত উক্তিকেই মিথ্যা ঘোষণা করা হচ্ছে। তার ফলে তাঁদের দশজনকেই মিথ্যাভাষী বলা হল। এ কারণেই ইসলামে সকল রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি কোন রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ না করবে, সে কাফের হয়ে যাবে, এমন কি অন্যান্য রাসূলের উপর ঈমান আনলেও এর কোন ব্যতিক্রম হবে না।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার বিভিন্ন কওমের কাছে যেসব নবী প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল এক লাখ চব্বিশ হাজার। কতকাল ধরে এ দুনিয়ায় মানুষের বসতি হয়েছে আর কত কওম দুনিয়া থেকে অতীত হয়ে গেছে, একথা ভেবে দেখলেই বুঝা যায়, এ সংখ্যাটা খুববেশী নয়। এ সোয়া লাখ নবীর মধ্যে থেকে যাদের নাম কুরআনে আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের প্রতি সুস্পষ্ট ঈমান পোষণ করা অপরিহার্য। বাকী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সবারই সম্পর্কে কেবলমাত্র এ ধারণা পোষণের শিক্ষা আমাদের দেয়া হয়েছে যে, যে লোককেই আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর বান্দাহদেরকে হেদায়াত করার জন্য পাঠানো হয়েছে তাঁরা খাঁটি ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন। হিন্দুস্তান, চীন, ইরান, মিসর, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং দুনিয়ার অন্যান্য দেশে যেসব নবী এসে থাকবেন আমরা তাঁদের সবারই প্রতি ঈমান পোষণ করি ; কিন্তু আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে যেমন বলতে পারি না যে, তিনি নবী ছিলেন, তেমনি একথাও বলতে পারি না যে, তিনি নবী ছিলেন না। কারণ, তাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুই বলা হয়নি। অবশ্যি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা

যেসব লোককে তাদের পথপ্রদর্শক বলে মেনে নেয়, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলা আমাদের পক্ষে বৈধ নয়। খুব সম্ভব হতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে কেউ সত্যিকার নবী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের অনুসারীরা তাদের প্রচারিত ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে, যেমন করে বিকৃত করেছে হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর অনুগামীরা। সুতরাং আমরা যে মত প্রকাশ করব তা তাঁর ধর্ম ও তাঁর রীতিনীতি সম্পর্কেই করব ; কিন্তু পথপ্রদর্শকদের সম্পর্কে আমরা নিরবতা অবলম্বন করব, যেন না জেনেশুনে কোন রাসূল সম্পর্কে অসংগত উক্তি করে আমরা অপরাধী না হই।

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মত অন্যান্য নবীরাও ছিলেন আল্লাহর সত্যিকার পয়গাম্বর ; তাঁরাও ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত, ইসলামের সহজ সরল পথ তারাও দেখিয়েছেন এবং তাঁদের সকলের উপর ঈমান পোষণের নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, এদিক দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁদের মধ্যে কোন তফাত নেই, কিন্তু এমনি সকল দিক দিয়ে সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও অন্যান্য পয়গাম্বরের মধ্যে তিনটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, পূর্ববর্তী নবীরা বিশেষ কওমে বিশেষ যামানার জন্য এসেছিলেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল তামাম দুনিয়ার জন্য ও সর্বকালের জন্য নবী হিসেবে। আগের অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়, পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা হয় দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অথবা কোনরূপ অবশিষ্ট থাকলেও নিজস্ব স্বরূপ সহ তা রক্ষিত হয়নি। এমনি করে তাঁদের সঠিক জীবন-কাহিনী আজ দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং তার সাথে মিলিত হয়ে গেছে সংখ্যাহীন গল্প-কাহিনী। এ কারণেই কেউ তাঁদের পথ অনুসরণ করতে চাইলেও তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষা, তাঁর পবিত্র জীবন-কথা, তাঁর মৌখিক উপদেশ, তাঁর অনুসৃত পন্থা, তাঁর নৈতিক জীবন, স্বভাব ও সৎকর্মসমূহ—এক কথায়, তাঁর জীবনের প্রতিটি জিনিস দুনিয়ার বুকে পূর্ণ সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। এ কারণেই প্রকৃতপক্ষে সকল পয়গাম্বরের মধ্যে কেবল হযরত (সা)-ই একমাত্র জীবন্ত পয়গাম্বর এবং একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করা সম্ভব হতে পারে।

তৃতীয়, পূর্ববর্তী নবীগণের মাধ্যমে ইসলামের যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তা সুসম্পূর্ণ ছিল না। প্রত্যেক নবীর পরে অপর কোন নবী এসে তাঁর আদেশ,

আইন ও হেদায়াতসমূহ সংশোধন ও সংযোজন করেছেন এবং এ সংশোধন ও উন্নতির ধারা বরাবর জারী রয়েছে। এ জন্যই এসব নবীর যামানা অতীত হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের শিক্ষাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সংরক্ষিত করে রাখেননি ; কেননা প্রত্যেকটি পূর্ণাংগ শিক্ষার পর তার পূর্ববর্তী অসম্পূর্ণ শিক্ষার আর প্রয়োজন থাকেনি। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে ইসলামের এমন শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা প্রত্যেক দিক দিয়ে সুসম্পূর্ণ। তার পূর্বে সকল নবীর শরীয়াত আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেছে, কেননা সম্পূর্ণ জিনিসকে পরিত্যাগ করে অসম্পূর্ণ জিনিসের অনুসরণ করা বুদ্ধিবৃত্তি বিরোধী। যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আনুগত্য করবে সে প্রকৃতপক্ষে সকল নবীরই আনুগত্য করবে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, সকল নবীর শিক্ষায় যা কিছু কল্যাণকর ছিল, তার সবকিছুই মওজুদ রয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষায়। আবার যে ব্যক্তি তার আনুগত্য ছেড়ে পূর্ববর্তী কোন নবীর আনুগত্য স্বীকার করবে, সে বহুবিধ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে, কেননা যেসব কল্যাণকর নির্দেশ পরবর্তীকালে এসেছে, আগেকার শিক্ষায় তা ছিল না।

উপরোক্ত কারণে তামাম দুনিয়ার মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আনুগত্য করা। মুসলমান হওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর ঈমান আনা তিনটি দিক দিয়ে মানুষের জন্য অত্যন্ত যরুরী।

প্রথমত, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর সত্যিকার পয়গাম্বর।

দ্বিতীয়, তাঁর হেদায়াত সর্বতোভাবে সুসম্পূর্ণ। তার মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতা নেই এবং তা সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত।

তৃতীয়, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর আখেরী পয়গাম্বর। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কওমের মধ্যে কোন নবী আসবেন না। অতপর এমন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব কখনো হবে না, মুসলমান হওয়ার জন্য যার উপর ঈমান আনা শর্ত হিসেবে গণ্য হবে অথবা যাকে না মানলে কোন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

আখেরাতের উপর ঈমান

পঞ্চম যে জিনিসটির উপর হযরত মুহাম্মাদ (সা) আমাদেরকে ঈমান পোষণের নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে আখেরাত। আখেরাত সংক্রান্ত যে জিনিসের উপর ঈমান পোষণ করা জরুরী তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ একদিন আল্লাহ্ তা'য়ালা সমগ্র বিশ্বজগত ও তার ভিতরকার সৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ দিনটির নাম হচ্ছে 'কিয়ামত'।

দুই ঃ আবার তাদের সবাইকে দেয়া হবে নতুন জীবন এবং তারা সবাই এসে হাযির হবে আল্লাহর সামনে। একে বলা হয় 'হাশর'।

তিন ঃ সকল মানুষ তাদের পার্থিব জীবনে যা কিছু করেছে, তার আমলনামা আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে।

চার ঃ আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল-মন্দ কাজের পরিমাপ করবেন। আল্লাহর মানদন্ডে যার সৎকর্মের পরিমাণ অসৎকর্ম অপেক্ষা বেশী হবে, তিনি তাকে মাফ করবেন এবং যার অসৎকর্মের পাল্লা ভারী থাকবে, তিনি তার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন।

পাঁচ ঃ আল্লাহর কাছ থেকে যারা মার্জনা লাভ করবে, তারা জান্নাতে চলে যাবে এবং যাদের শাস্তি বিধান করা হবে, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আখেরাত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা

আখেরাতের ধারণা যেভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সা) পেশ করে গেছেন, তার আগেকার নবীরাও ঠিক তেমনি করে তা পেশ করে এসেছিলেন এবং প্রত্যেক যামানায় মুসলমান হওয়ার জন্য এটা ছিল অপরিহার্য শর্ত। যে ব্যক্তি আখেরাতকে অস্বীকার করেছে অথবা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, সকল নবীই তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন, কেননা এ ধারণা ব্যতীত আল্লাহকে, তার প্রেরিত কিতাব ও রাসূলদেরকে মেনে নেয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যায় এবং মানুষের সমগ্র জীবনই হয় বিকৃত। বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখলে সহজেই কথাটি হৃদয়ংগম করতে পারা যাবে। কাউকে যখন কোন কাজের কথা বলা হয়, তখন সবার আগে তার মনে প্রশ্ন জাগে ঃ এ কাজ করলে কি লাভ হবে, আর না করলেই বা কি ক্ষতি হবে ? এ প্রশ্ন কেন জাগে ? যে কাজে কোন লাভ নেই, মানুষ তাকে মনে করে অর্থহীন ও ব্যর্থ। যে কাজ সম্পর্কে মানুষের অন্তরে প্রত্যয় রয়েছে যে, তাতে কোন ফায়দা হবে না, তা করার জন্য মানুষ কখনো তৈরী হবে না। তেমনি এমন কোন কাজ থেকে কেউ বিরত হয়ে থাকতে রাযী হবে না, যাতে কোন ক্ষতি হবে না বলে প্রত্যয় রয়েছে। সন্দেহের ক্ষেত্রেও এ একই অবস্থা। যে কাজের লাভ সম্পর্কে কারো সন্দেহ রয়েছে, তাতে সে কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারবে না। কোন কাজ ক্ষতিকর কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তা থেকে বেঁচে থাকবার জন্য সে কোন বিশেষ চেষ্টা করবে না। শিশুদের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ মেলে। শিশুরা আগুনে হাত দেয় কেন ? তার কারণ হচ্ছে ঃ তাদের মনে প্রত্যয় নেই যে, আগুন পুড়িয়ে দেয়। আবার পড়াশুনা থেকে তারা কেন দূরে থাকতে চায় ? তার কারণ হচ্ছে ঃ তাদের গুরুজনরা এ থেকে যেসব কল্যাণ

প্রাপ্তির কথা তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন, তা তাদের মনে লাগছে না। অনুরূপ কারণেই যে লোক আখেরাতে বিশ্বাসী নয়, সে আল্লাহকে মানা ও তার ইচ্ছানুযায়ী চলাকে মনে করে নিষ্ফল। তার কাছে আল্লাহর আনুগত্যে যেমন কোন লাভ নেই, তেমনি তার না-ফরমানীতেও কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যেসব আদেশ দিয়েছেন, তার আনুগত্য করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে ? যদি ধরে নেয়া যায় যে, সে আল্লাহকে মেনে নিয়েছে, তা হলেও তার সে মানা সম্পূর্ণ নিরর্থক, কেননা সে আল্লাহর প্রদত্ত আইনের আনুগত্য করবে না এবং তার ইচ্ছা অনুসারে চলবে না।

এখানেই ব্যাপারটি শেষ নয়। আরো ভাল করে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, আখেরাতের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি মানুষের জীবনে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। আগেই বলেছি, মানুষের স্বভাবই হচ্ছে এমনি যে, সে যে কোন কাজ করার বা না করার সিদ্ধান্ত করে তার লাভ-ক্ষতির দিক বিবেচনা করে। এখন এক ব্যক্তির নযর কেবল দুনিয়ার লাভ-ক্ষতির উপর নিবদ্ধ। এমন কোন সৎকাজের প্রবণতা তার মধ্যে কখনো দেখা যাবে না, যার কোন লাভ এ দুনিয়ায় প্রাপ্তির আশা নেই ; আবার এমন কোন কাজ থেকে সংযত হয়ে থাকবে না, যা থেকে এ দুনিয়ার বুকেই কোন ক্ষতি হওয়ার মতো বিপদ সম্ভাবনা না থাকবে। অপরদিকে আর এক ব্যক্তি রয়েছে, যার নযর রয়েছে কাজের শেষ পরিণামের উপর। দুনিয়ার লাভ ক্ষতিকে সে মনে করে ক্ষণস্থায়ী। সে আখেরাতের স্থায়ী লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করেই সৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে আর অসৎকর্মের পথ বর্জন করে চলবে, তাতে সৎকর্ম থেকে তার যত বড় ক্ষতিই আসুক আর অসৎকর্ম থেকে যত বেশী লাভের সম্ভাবনাই থাকুক। চিন্তা করা দরকার এদের দু'জনের মধ্যে কত বড় প্রভেদ। একজনের কাছে সৎকাজ হচ্ছে তাই, যার ফল সে পাবে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে ; যেমন কিছু টাকা তার মিলবে, কিছু যমীন তার অধিকারে আসবে, হয়ত কোন পদ, সুনাম -সুখ্যাতি ও মানুষের বাহবা মিলবে, হয়ত কোন লালসা চরিতার্থ হবে, কিছুটা অকাংখা তার পূর্ণ হবে ; হয়ত কিছুটা ভোগের পরিতৃপ্তি সে পাবে ? তার ধারণা অনুযায়ী অসৎকাজ হচ্ছে তা-ই যাতে এ জীবনে কোন খারাপ পরিণাম আসে অথবা আসার ভয় থাকে ; যেমন ধন-প্রাণের ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, সরকার তরফের শাস্তি, কোন রকম দুঃখ-কষ্ট অথবা অবাঞ্ছিত অবস্থা। পক্ষান্তরে, অপর ব্যক্তির কাছে সৎকাজ হচ্ছে তা-ই যাতে আল্লাহ খুশী হন, আর অসৎকাজ হচ্ছে তা-ই যাতে আল্লাহ নারায হন। সৎকাজের ফলে দুনিয়ায় যদি তার কোন লাভ না হয়, বরং কোন ক্ষতি হয়, তবুও সে তাকে সৎকাজই মনে করে এবং প্রত্যয় পোষণ করে যে, শেষ পর্যন্ত তার সৎকাজের জন্য চিরদিনের প্রাপ্য লাভ সে

আল্লাহর কাছে পাবে। অসৎকর্ম থেকে যদি তার কোন ক্ষতি নাও হয়, কোন ক্ষতির ভয় না থাকে বরং তার ফলে তার কাছে কেবল সুযোগ-সুবিধাই আসতে থাকে, তবুও সে তাকে অসৎকর্মই মনে করে এবং প্রত্যয় পোষণ করে যে, যদি দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবনে শাস্তি থেকে বেঁচে যায় এবং কিছু দিন মজা লুটবার সুযোগ পায় ; তবু শেষ পর্যন্ত আযাব থেকে তার রেহাই নেই।

এ দু'টি বিভিন্ন ধারণার প্রভাবে মানুষ দু'টি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি আখেরাতের উপর প্রত্যয় পোষণ করে না, তার পক্ষে ইসলামের পথে এক পাও অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইসলাম বলে ঃ 'আল্লাহর পথে গরীবকে যাকাত দাও।' জবাবে সে বলে ঃ 'যাকাত দিতে গেলে আমার সম্পত্তি কমে যাবে। আমার অর্থের উপর আমি সুদ নেব এবং সুদের ডিক্রিতে তাদের ঘরের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ক্রোক করে নেব। ইসলাম বলে ঃ 'হামেশা সত্যিকথা বল, আর মিথ্যা থেকে সংযত হয়ে থাক, সত্যভাষণে তোমার যতই ক্ষতি হোক আর মিথ্যা ভাষণে যতই লাভ হোক।' জবাবে সে বলে ঃ এমন সত্যকে গ্রহণ করে আমি কি করব, যাতে আমার কেবল ক্ষতিই হবে, কোন লাভ হবে না ? আর এমন মিথ্যা থেকে আমি সংযত হয়ে থাকব কেন, যা আমার জন্য লাভজনক হবে এবং যাতে কোন দুর্নামের ভয় পর্যন্ত নেই ? এক নিঃসংগ পথ অতিক্রম করতে করতে তার নযরে পড়ছে একটি বহু মূল্যবান বস্তু, অমনি ইসলাম তাকে বলে, 'এ তোমার সম্পত্তি নয়, কিছুতেই তুমি এ জিনিস গ্রহণ করতে পার না।' সে তার জবাব দেয় ঃ 'আপনা-আপনি যে জিনিস আসে তা কেন ছেড়ে দেব। এখানে তো এমন কেউ নেই, যে দেখে পুলিশকে খবর দেবে, অথবা আদালতে সাক্ষ্য দেবে, অথবা লোকের কাছে আমার বদনাম করবে। এরপর কেন আমি কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ থেকে লাভবান হব না ? একটি লোক গোপনে তার কাছে কিছু জিনিস আমানত রেখে মারা যায়। ইসলাম তখন তাকে বলে ঃ 'আমানত বিনষ্ট কর না ; যার ধন তার সন্তান-সন্তুতির কাছে পৌছে দাও।' সে বলে উঠে ঃ 'কেন ? মৃত ব্যক্তির ধন যে আমার কাছে রয়েছে, তার তো কোন সাক্ষী নেই, তার সন্তান সন্তুতিও এ খবর জানে না। সহজেই আমি যখন কোন আইনের ভয় না করে, কোন বদনামীর আশংকা না করে আত্মসাৎ করতে পারি, তখন কেন তা করব না ? সোজা কথায় জীবনের পথে প্রত্যেক পদক্ষেপে ইসলাম তাকে এক বিশেষ পথে চলার নির্দেশ দেবে, আর সে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অনুসরণ করে চলবে। কেননা ইসলামে প্রত্যেকটি জিনিসের কদর ও মূল্যমান নির্ধারিত হয় আখেরাতের স্থায়ী ফলাফল বিবেচনায় ; কিন্তু সে ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যাপারে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে পাওয়ার মত ফলাফলের উপর।

আখেরাতের উপর ঈমান পোষণ ব্যতীত মানুষ যে কেন মুসলমান হতে পারে না, তা এখন সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যায়। মুসলমান হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃতপক্ষে আখেরাতকে অস্বীকার করে মানুষ মনুষ্যত্ব থেকে নেমে গিয়ে পশুত্ব অপেক্ষাও নিম্নতর স্তরে চলে যায়।

আখেরাত বিশ্বাসের সত্যতা

আখেরাত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণকারিতা আলোচনা করার পর এখন সংক্ষেপে বলতে চাই যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আখেরাত-বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদেরকে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা, যুক্তির দিক দিয়েও সত্য বলে আপনাদের বোধগম্য হয়। যদিও নিছক যুক্তিভিত্তিক না হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থার উপরই আমাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তবুও আমরা যখন বিশেষভাবে চিন্তা করি, তখন আখেরাত সম্পর্কিত সকল বিশ্বাসের মধ্যে এ বিশ্বাসকেই সবচেয়ে যুক্তিভিত্তিক মনে হয়।

আখেরাত সম্পর্কে দুনিয়ায় তিন রকমের বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে ঃ

এক দলের ধারণা, মরার পর মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর আর কোন জীবন নেই। এ হচ্ছে নাস্তিকের বিশ্বাস, যারা নিজেদেরকে বিজ্ঞানী বলে দাবী করে।

দ্বিতীয় দল বলে, মানুষ নিজস্ব কর্মফল ভোগ করার জন্য বারবার এ দুনিয়ায় দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অসৎ কাজ করলে পরজন্মে তারা কুকুর বিড়ালের মত কোন জানোয়ার হয়ে আসবে, অথবা কোন গাছ হয়ে জন্মাবে, অথবা কোন নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের আকৃতি ধারণ করবে। আর যদি ভাল কাজ করে, তাহলে আরো উঁচু স্তরের জীবনে পৌছবে। কোন কোন জড়ত্ব প্রাপ্ত ধর্মে এ ধরনের ধারণা প্রচলিত রয়েছে।

তৃতীয় দল কিয়ামত, পুনর্জীবন লাভ, আল্লাহর আদালতে উপস্থিতি এবং কৃতকর্মের প্রতিদান ও প্রতিফলের উপর ঈমান পোষণ করে। এ হচ্ছে সকল নবীর সাধারণ বিশ্বাস।

এবার প্রথম বিশ্বাস সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ 'মরার পর কাউকে জীবিত হতে আমরা দেখিনি। আমরা বরং দেখি মানুষ মরার পর মাটিতে মিশে যায়। সুতরাং মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে বুঝা যায় যে, এ কথার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। মরার পর কাউকে জীবিত হতে দেখা যায়নি, এ জন্য বড় জোর বল যায় ঃ মরার পর কি হবে, আমরা জানিনা।' এর চেয়ে এগিয়ে গিয়ে যে দাবী করা হয়, মরার

পর কিছুই হবে না, আমরা জানি এর স্বপক্ষে কি প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে ? যে পল্লিবাসী কখনো উড়োজাহাজ দেখেনি, সে বলতে পারে : 'উড়োজাহাজ কি জিনিস, আমার জানা নেই।' কিন্তু সে যখন বলে : 'আমি জানি উড়োজাহাজ বলতে কোন জিনিসই নেই।' তখন বুদ্ধিমান লোকেরা তাকে নির্বোধ বলবেন। কারণ কোন বিশেষ জিনিস না দেখবার অর্থ এ হতে পারে না যে, তা কোন জিনিসই নয়। একটি মানুষ কেন, বরং সারা দুনিয়ার মানুষও যদি একটা বিশেষ জিনিস না দেখে থাকে, তবুও এ দাবী করা চলে না যে, সে জিনিসটির অস্তিত্ব নেই অথবা তা থাকতেই পারে না।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বিবেচনা করা যাক। এ বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষ যখন মানুষ হিসেবে বর্তমান জীবন যাপন করেছে, তখন তার কারণ হচ্ছে, বিগত জীবনে সে জানোয়ার থাকা অবস্থায় সৎকার্য করেছিল আর যে জানোয়ার বর্তমান জীবন জানোয়ার হিসেবে অতিবাহন করছে, অতীত জীবনে মানুষ হিসেবে বসবাস করে সে অসৎকার্য করেছিল। অন্য কথায় মানুষ, জানোয়ার অথবা বৃক্ষ হওয়া প্রকৃতপক্ষে অতীত জীবনের কর্মফল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : প্রথমে কি জিনিস ছিল ? যদি বলা হয় যে, সবার আগে ছিল মানুষ, তাহলে মেনে নিতে হবে যে, তারও আগে ছিল জানোয়ার অথবা বৃক্ষ, নইলে প্রশ্ন উঠবে : মানুষের আকৃতি কোন্ সৎকর্মের বদলায় পাওয়া গিয়েছিল ? যদি বলা হয়, সবার আগে পশু অথবা বৃক্ষ ছিল ; তাহলে মেনে নিতে হবে যে, তারও আগে ছিল মানুষ নইলে প্রশ্ন উঠে : বৃক্ষ অথবা পশুর আকৃতি কোন অসৎকর্মের শাস্তি স্বরূপ পাওয়া গিয়েছিল ? সোজা কথায়, এ বিশ্বাসের অনুসারীরা সৃষ্টির প্রারম্ভিক রূপ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে না, কেননা যে কোন রূপের আগে অপর এক রূপ পরিকল্পনা তাদের পক্ষে অপরিহার্য, যাতে পরবর্তী রূপকে পূর্ববর্তী রূপসম্পন্ন সৃষ্টির কর্মফল বলে ধরে নেয়া যায়। এ বিশ্বাস সোজাসুজি যুক্তি বিরোধী।

এবার তৃতীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বিবেচনা করা যাক। এতে সবার আগে বলা হয়েছে : 'একদিন কিয়ামত আসবে এবং আল্লাহ নিজেই তার এ কারখানাকে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তার জায়গায় গড়ে তুলবেন আর এক উচ্চতর পর্যায়ের উৎকৃষ্টতর কারখানা।' এ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দুনিয়ার এ কারখানা নিয়ে যত চিন্তা করা যায়, তত বেশী করে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এটা একটি স্থায়ী কারখানা নয়, কারণ যেসব শক্তি এর ভিতরে কাজ করে যাচ্ছে, তারা সবাই সীমাবদ্ধ ও একদিন তাদের সমাপ্তি নিশ্চিত। এ কারণে সকল বিজ্ঞানী এ সম্পর্কে এক মত

যে, একদিন সূর্য শীতল ও জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, গ্রহ উপগ্রহসমূহের পরস্পরের মধ্যে ঘটবে সংঘাত এবং দুনিয়া হয়ে যাবে ধ্বংস।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে ঃ 'মানুষকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করা হবে।' এও কি সম্ভব ? যদি অসম্ভব হয়, তা হলে মানুষ বর্তমানে যে জীবন উপভোগ করছে, তা কি করে সম্ভব হল ? স্পষ্টত যে আল্লাহ এ দুনিয়ায় মানুষকে পয়দা করেছেন, আর কোন দুনিয়ায়ও তিনি মানুষকে আবার নতুন করে পয়দা করতে পারেন।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে ঃ 'মানুষ এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু কাজ করেছে, সবকিছুর রেকর্ড সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে এবং হাশরের দিন তা পেশ করা হবে।' এ দুনিয়ায়ও এর প্রমাণ আজ আমরা পাচ্ছি। আগেকার দিনের চলতি ধারণা ছিল যে, যে আওয়ায মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, হাওয়ার উপর তা কিছুটা তরঙ্গ সৃষ্টি করে মিলিয়ে যায়। কিন্তু আজকের দিনে আমরা জানতে পারছি যে, প্রত্যেক আওয়ায তার গতি পথে বিভিন্ন জিনিসের উপর তার দাগ রেখে যায়। সে আওয়ায আবার নতুন করে সৃষ্টি করা যায়। অবশ্যি এ নীতির উপরই উদ্ভাবন করা হয়েছে গ্রামোফন রেকর্ড।

তা থেকেই বুঝা যায় যে, যেসব জিনিস আমাদের গতিপথে আসছে, তার সব কিছুতেই আমাদের গতিবিধির চিহ্ন অংকিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্পূর্ণ আমলনামা যে সংরক্ষিত হয়ে আছে এবং তা যে পুনরায় হাযির করা যেতে পারে, তা এ অবস্থা থেকে প্রত্যয় সহকারে উপলব্ধি করা যেতে পরে।

চতুর্থ বিষয় হচ্ছে ঃ 'আল্লাহ হাশরের দিনে আদালত বসাবেন, ন্যায়নীতি অনুযায়ী আমাদের ভাল-মন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি বিধান করবেন। একে কে অসম্ভব বলতে পারে ? এর মধ্যে কোন্ কথাটি যুক্তি বিরোধী ? যুক্তির দাবীই তো হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর ন্যায়ের আদালতে ন্যয়নীতি অনুযায়ী সবকিছুর সিদ্ধান্ত করবেন। আমরা দেখতে পাই, এক ব্যক্তি ভাল কাজ করে, অথচ দুনিয়ায় তার কোন লাভ সে পায় না। আবার এক ব্যক্তি খারাপ কাজ করে যায়, অথচ তার কোন ক্ষতি সে ভোগ করে না। শুধু তাই নয়, বরং আমরা এমনি হাযার হাযার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, ব্যক্তি বিশেষ ভাল কাজ করে যাচ্ছে অথচ উল্টা তার ক্ষতি হচ্ছে। পক্ষান্তরে, অপর ব্যক্তি খারাপ কাজ করেও বেশ মজা লুটছে। এ ধরনের সব ঘটনা লক্ষ্য করে যুক্তি দাবী করে যে, কোন না কোন জায়গায় সৎকর্মশীল ব্যক্তির সৎকার্যের ও দুষ্কৃতি পরায়ণ ব্যক্তির দুষ্কৃতির প্রতিফলন পাওয়া প্রয়োজন।

সর্বশেষ জিনিস হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম। তার অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। যে আল্লাহ চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল গ্রহ ও যমীন সৃষ্টি করতে পারলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি

কেন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতে পারবেন না ? তিনি যখন আদালত বসিয়ে মানুষের ভাল-মন্দের পুরস্কার ও শাস্তি বিধান করবেন, তখন পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য লোকদের কোন বিশেষ সম্মান, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্থান এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য লোকদের জন্য অপমান, দুঃখ ও বেদনা ভোগের স্থান নির্দিষ্ট থাকাও প্রয়োজন।

এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে যুক্তি আপনিই বলে উঠবে যে, দুনিয়ার মানুষের পরিণাম সম্পর্কে যত ধারণা রয়েছে, তার মধ্যে এ ধারণাই হচ্ছে সবচেয়ে যুক্তিসংগত এবং এর ভিতরে অযৌক্তিক অথবা অসম্ভব কিছুই নেই।

আল্লাহর সাচ্চা নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) যখন একে সত্য বলে বর্ণনা করে গেছেন এবং এর সবকিছুই আমাদের জন্য কল্যাণকর, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এর উপর প্রত্যয় পোষণ করা এবং বিনা যুক্তিতে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা।

কালেমা তাইয়েবা

ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূর্ববর্ণিত এ পাঁচটি বিশ্বাসের উপর। এ পাঁচটি[১] বিশ্বাসের সারবস্তু রয়েছে কেবলমাত্র এক কালেমারই মধ্যে ঃ

لا اله الا الله محمد رسول الله

একজন মানুষ যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তখন সে সকল মিথ্যা উপাস্যকে বর্জন করে কেবল এক আল্লাহর দাসত্বের প্রতিশ্রুতি দান করে। আবার যখন 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে, তখন সে এ কথাটির সত্যতা স্বীকার করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহরই রাসূল। রিসালাতের সত্যতা স্বীকারের সাথে সাথে অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে যে, আল্লাহর সত্তা ও গুণরাজি, ফেরেশতামন্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, পয়গাম্বরগণ ও আখেরাত সম্পর্কে যা কিছু ও যেমন কিছুরই শিক্ষা হযরত মুহাম্মাদ (সা) দিয়ে গেছেন, তার প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের যে পথ তিনি নির্দেশ করেছেন তার অনুসরণ করতে হবে।

---

১. এখানে আমি ঈমানের বিষয়সমূহের সংখ্যা পাঁচটি বলছি। এ পাঁচটি বুনিয়াদ কুরআন মজীদের সূরা বাকারা ঃ ৪০ রুকু'তে امن الرسول بما انزل اليه من ربه ও সূরা নেসা ঃ ২০ রুকু'তে ومن يكفر بالله وملئكته প্রভৃতি আয়াতে বিবৃত হয়েছে। হাদীস শরীফে নিসন্দেহে القدر خيره وشره -কেও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনি করে বুনিয়াদী বিশ্বাসের বিষয়সমূহের সংখ্যা পাঁচটির পরিবর্তে ছয়টি ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈমান বিলকাদর ঈমান বিল্লাহরই একটি অংশ এবং কুরআন মজীদে এ বিশ্বাসটিকে সেভাবেই বিবৃত করা হয়েছে। সুতরাং আমি এ বিশ্বাসটিকেও তাওহীদ বিশ্বাসের ব্যাখ্যার সাথে সংযোজিত করার সিদ্ধান্ত করেছি। অনুরূপভাবে কোন কোন হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত বিশ্বাসকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঈমান বিল আখেরাতেরই অংশ।

ইবাদাত

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) পাঁচটি জিনিসের উপর ঈমান আনার শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

এক ঃ এক লা-শরীক আল্লাহর উপর।

দুই ঃ আল্লাহর ফেরেশতাদের উপর।

তিন ঃ আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর, বিশেষ করে কুরআন মজীদের উপর।

চার ঃ আল্লাহর রাসূলের উপর, বিশেষ করে তাঁর আখেরী রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর।

পাঁচ ঃ আখেরাতের জীবনের উপর।

ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে এই। একজন যখন এ পাঁচটি জিনিসের উপর ঈমান আনলো তখনই সে মুসলমানদের দলভুক্ত হল, কিন্তু এতেই সে পুরো মুসলিম হতে পারলো না। পুরো মুসলিম মানুষ তখনই হতে পারে যখন আল্লাহর তরফ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আনীত হুকুমসমূহের আনুগত্য সে করে, কেননা ঈমান আনার সাথে সাথেই আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে এবং এ আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। চিন্তা করা যায়, একজন লোক স্বীকার করে নিয়েছে একমাত্র আল্লাহই তার ইলাহ। এর অর্থ হচ্ছে একমাত্র তিনিই তার মনিব, আর সে তাঁর গোলাম, একমাত্র তিনিই তাদের আদেশ-দাতা, আর সে তাঁর আজ্ঞাবহ। এ মনিব ও আদেশ-দাতাকে মেনে নেয়ার পর না-ফরমানী করলে সে নিজেই নিজের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অপরাধী হল। সে আরো স্বীকার করে নিয়েছে যে, কুরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব। তার অর্থ হচ্ছে, যা কিছু কুরআন মজীদে রয়েছে, তাকে সে আল্লাহর ফরমান বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এখন তার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, এর প্রত্যকটি কথাকে মেনে নেয়া এবং প্রত্যেকটি হুকুমের কাছে মাথা নত করা। সে এও স্বীকার করে নিয়েছে যে হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। প্রকৃতপক্ষে এতে স্বীকার করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) যা কিছু করার হুকুম দিয়েছেন এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা আল্লাহর তরফ থেকেই করেছেন। এ স্বীকৃতির পর হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আনুগত্য করা তার জন্য ফরয হয়ে গেছে। সুতরাং যে পুরো "মুসলিম" হবে তখন যখন তার কার্যকলাপ হবে তার ঈমানের অনুরূপ, তার ঈমান ও কার্যকলাপের মধ্যে যতটা তফাৎ থাকবে তার ঈমান ততটা অপূর্ণ থাকবে।

এবার বলবো, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আমাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী জীবন যাপনের কি পদ্ধতি শিখিয়েছেন, কি কি কাজ করার হুকুম তিনি দিয়েছেন এবং কি কি নিষেধ করেছেন। এ প্রসংগে সবার আগে এমন সব ইবাদাতের কথা বলা যায় যা আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।

ইবাদাতের তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ইবাদাতের অর্থ হচ্ছে বন্দেগী বা দাসত্ব। মানুষ হচ্ছে বান্দাহ (দাস)। আল্লাহ্ মানুষের মা'বুদ (উপাস্য)। বান্দাহ তার মা'বুদের আনুগত্যের জন্য যা কিছু করে থাকে তাই-ই হচ্ছে 'ইবাদাত'। আমরা লোকের সাথে কথা বলছি ; কথা-বার্তায় আমরা মিথ্যা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা থেকে সংযত থাকছি, কেননা আল্লাহ্ তা নিষেধ করেছেন ; হামেশা সত্য, ন্যায়, সততা ও পবিত্রতার কথা বলছি ; কেননা আল্লাহ্ এসব জিনিস পসন্দ করে থাকেন। আমাদের এ কথাবার্তাগুলো যতই পার্থিব ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক না কেন, তা হবে আমাদের ইবাদাত। আমরা মানুষের সাথে টাকা-পয়সা লেন-দেন করছি, বাজারে জিনিসপত্র কেনা-বেচা করছি, নিজের ঘরে মা-বাপ, ভাই-বোনের সাথে বাস করছি, নিজের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনের সাথে মেলামেশা করছি। আমরা যদি জীবনের এসব কাজে আল্লাহর বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন মেনে চলি, এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী যদি অপরের অধিকার রক্ষা করে চলি, এবং আল্লাহর নিষেধ হওয়ার কারণে যদি অপরের অধিকার হরণ থেকে বিরত থাকি, তা হলে আমাদের সারা-জীবনই আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত হল বলতে হবে। আমি গরীবদের সাহায্য করলাম, কোন ভূখা মানুষকে খেতে দিলাম, কোন রোগীর শুশ্রূষা করলাম এবং এসব কাজে ব্যক্তিগত স্বার্থ, সম্মান ও সুখ্যাতির পরিবর্তে আল্লাহর সন্তোষকেই দৃষ্টির সামনে রাখলাম। এ ক্ষেত্রে আমার এসব কাজই ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হবে। ব্যবসায় শিল্পকারিতা অথবা কায়িক পরিশ্রম করছে মানুষ এবং তাতে আল্লাহর ভীতি পোষণ করে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারী সহকারে কাজ করছে, হালাল জীবিকা অর্জন করছে ও হারাম থেকে বেঁচে থাকছে, তার জীবিকা অর্জনও আল্লাহর ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও সে নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তথাপি তা ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হবে, সোজা কথা হচ্ছে এই যে, পার্থিব জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর ভীতি পোষণ করতে হবে, এবং তাঁর সন্তোষ বিধানকে লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে, তার প্রদত্ত বিধান অনুসরণ করতে হবে, তাঁর না-ফরমানীর মাধ্যমে প্রাপ্য লাভ উপেক্ষা করতে হবে এবং তার আনুগত্যের ফলে ক্ষতি হলে অথবা হওয়ার আশংকো থাকলেও তা স্বীকার করে নিতে হবে। এ হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এমন কি এ ধরনের জীবনে খাওয়া, পরা, চলা, ফেরা, শোয়া, জাগা, কথা-বার্তা—সবকিছুই ইবাদাতের অন্তর্গত।

এ হচ্ছে ইবাদাতের আসল অর্থ। ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানকে এমনি ইবাদাতে অভ্যস্ত বান্দাহ হিসেবে তৈরী করা। এ উদ্দেশ্যে ইসলামে এমন কতকগুলো ইবাদাত ফরয করে দেয়া হয়েছে, যার ফলে মানুষ এ বৃহত্তর ইবাদাতের জন্য তৈরী হয়ে উঠবে। অবশ্যি এও জেনে রাখা দরকার যে, বৃহত্তর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির জন্য 'ট্রেনিং কোর্স' হিসেবে এসব ইবাদাত নির্ধারিত হয়েছে। যে ব্যক্তি যত ভাল করে এ ট্রেনিং নেবে তত ভাল করে বৃহত্তর ও প্রকৃত ইবাদাত সম্পন্ন করতে পারবে। এ কারণেই এসব বিশেষ ইবাদাতকে ফরযে-আইন বলা হয়েছে এবং এগুলোকে আরকানে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনের স্তম্ভস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি ইমারত যেমন কতগুলো স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি করে ইসলামী জীবনের ইমারতও এসব স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব স্তম্ভ ভেঙ্গে দিলে ইসলামের ইমারতই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সালাত

এসব ফরযের মধ্যে প্রথম ফরয হচ্ছে সালাত। সালাত কি যেসব জিনিসের উপর একজন মুসলিম ঈমান এনেছে, দিনে পাঁচবার কথায় ও কাজে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করাই হচ্ছে সালাত। মুসলিম ব্যক্তি প্রত্যুষে উঠে আর সবকিছুর আগে পাক-সাফ হয়ে মহান প্রভুর সামনে হাযির হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে, বসে, অবনত হয়ে, যমীনের উপর মাথা রেখে তার দাসত্ব স্বীকার করে, তার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে, নতুন করে তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, বারবার তার সন্তোষ বিধানের ও তার গযব থেকে বাঁচবার আকাঙ্খার পুনরাবৃত্তি করে, তার কিতাবের শিক্ষা পুনরাবৃত্তি করে। তার রাসূলের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে, এবং তার আদালতে জবাবদিহির জন্য হাযির হওয়ার দিনের কথাও স্মরণ করে। এমনি করে, শুরু হল তার দিন। কয়েক ঘন্টা সে তার কাজে লিপ্ত থাকল, আবার যোহরের সময়ে মুয়ায্যিন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল কয়েক মিনিটের জন্য সেই শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করার কথা, যাতে সে কখনো তা ভুলে গিয়ে মহান প্রভুর সম্পর্কে অমনোযোগী না হয়। সে উঠে এসে তার ঈমানকে তাযা করে নিয়ে আবার ফিরে যায় দুনিয়া ও তার কাজ-কারবারের দিকে। কয়েক ঘন্টা পর আবার আসরের সময়ে তার ডাক পড়ে এবং সে আবার ঈমান তাযা করে নেয়। তারপর মাগরিব এল ও রাত শুরু হয়ে গেল। প্রত্যুষে উঠে যে ইবাদাতের মধ্যে দিয়ে সে শুরু করেছিল তার দিন, রাতও শুরু করলো সে সেই একই ইবাদাতের মধ্য দিয়ে, যেন সেই শিক্ষাকে সে ভুলতে না পারে এবং কোনরূপ ভুল না করে বসে। কয়েক ঘন্টা পর আসে এশার সময় এবং তার সাথে সাথেই আসে নিদ্রার সময়। এবার শেষবারের মত তাকে ঈমানের পুরো শিক্ষাটা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, কেননা এ হচ্ছে প্রশান্তির সময়। দিনের গোলযোগের মধ্যে যদি সে পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার

সুযোগ না পেয়ে থাকে তা হলে এ সময়ে সে নিশ্চিন্ত চিত্তে মনোযোগ দিতে পারবে।

এ জিনিসটি প্রতিদিন পাঁচবার মুসলিম ব্যক্তির ইসলামের বুনিয়াদ মযবুত করে দেয়। যে বৃহত্তর ইবাদাতের তাৎপর্য আমি একটু আগে বিশ্লেষণ করেছি, সালাত মুসলমানদেরকে তারই জন্য তৈরী করে। সালাত তাদের সবরকম বিশ্বাসকে তাযা করে দেয় এবং এরই উপর তাদের আত্মার পবিত্রতা, রূহের উন্নতি, স্বভাবের সুষ্ঠুতা ও কর্মের সংশোধন নির্ভর করে। চিন্তা করলেই বুঝা যায় খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলে গেছেন, অযুতে সেই পদ্ধতি কেন অনুসরণ করা হচ্ছে এবং তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন, সালাতে কেন তার সবকিছুই আমরা আদায় করছি ? এর কারণ হচ্ছে, আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আনুগত্য করা ফরয মনে করছি। ইচ্ছা করে কুরআন কেউই ভুল পড়ছেন না কেন ? তার কারণ প্রত্যেকেই তাকে আল্লাহর কালাম বলে প্রত্যয় পোষণ করেছে। সালাতে চুপি চুপি যা পড়া হচ্ছে তা যদি না পড়া হয় অথবা অপর কিছু পড়া হয়, তাতে কি কাউকে ভয় করার প্রয়োজন আছে ? কোন মানুষ তো তা শুনছে না। বুঝা যায় প্রত্যেক মুসল্লী নিজেই উপলব্ধি করেছে যে, চুপি চুপি যা কিছু পড়ছি, আল্লাহ তাও শুনতে পান এবং আমার গোপন গতিবিধিও তাঁর কাছে অজানা নেই। যেখানে কেউ দেখার নেই সেখানে মুসলিমকে সালাতের জন্য কে তুলে দেয় ? এর মূলে রয়েছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। সালাতের সময় সবচেয়ে জরুরী কাজ ফেলে রেখে কোন্ জিনিসটি একজনকে সালাতের দিকে টেনে নিয়ে যায় ? তা হচ্ছে তার মনের এ অনুভূতি যে, আল্লাহ তার উপর সালাত ফরয করে দিয়েছেন। শীতের দিনে ভোর বেলা, গ্রীষ্মের দুপুরে ও প্রতিদিন সন্ধ্যার আলাপ-আলোচনার মধ্যে মাগরিবের সময়ে কোন্ জিনিসটি মুসলমানকে সালাত আদায় করতে বাধ্য করে ? কর্তব্যবোধ ছাড়া আর কি হতে পারে ? সালাত না আদায় করা অথবা সালাতে জেনে-শুনে ভুল করার ব্যাপারে কেন লোকে ভয় করে ? তার কারণ, তার মনের মধ্যে আল্লাহর ভীতি রয়েছে এবং সে জানে যে, একদিন তাকে হাযির হতে হবে তাঁর আদালতে। এখন প্রশ্ন এই যে, সালাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন ট্রেনিং হতে পারে যা পুরোপুরি সত্যিকার মুসলমান বানিয়ে দিতে পারে ? মুলমানদের জন্য এর চেয়ে ভাল শিক্ষা আর কি হতে পারে যা প্রতিদিন কয়েকবার মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর ভীতি, তাঁর হাযির-নাযির থাকার প্রত্যয় এবং তাঁর আদালতে হাযির হওয়ার বিশ্বাস জাগিয়ে দেয়, দৈনিক কয়েকবার বাধ্যতামূলক ভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পথ অনুসরণ করতে প্ররোচিত করে এবং প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা পর পর তার দায়িত্ব পালনের মহড়া

দেয়ার ব্যবস্থা করে। এহেন ব্যক্তি থেকে প্রত্যাশা করা যায় যে, সালাত শেষ করে সে যখন দুনিয়ার কাজ-কারবারে লিপ্ত হবে, সেখানেও সে আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর আইন মেনে চলবে এবং কোন গুনাহ্ করার সম্ভাবনা দেখা গেলে তার মনে পড়বে যে, আল্লাহ্ তাকে দেখছেন। এমনি উচ্চ পর্যায়ের ট্রেনিং-এর পর যদি কারুর মধ্যে আল্লাহর ভীতি না থাকে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে বিপরীত পথে চলা যদি সে না ছাড়ে, তবে তা সালাতের দোষ নয় বরং সেই ব্যক্তির নিজের দোষই তাতে প্রমাণিত হয়।

আরো বিবেচনার বিষয় হইল, আল্লাহ্ তা'য়ালা জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার তাকিদ দিয়েছেন এবং বিশেষ করে সপ্তাহে একবার জুময়ার সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন। তার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। তারা সবাই মিলে গড়ে তোলে একটি শক্তিশালী জোট। তারা সবাই মিলে যখন আল্লাহর ইবাদাত করে, এক সাথে ওঠাবসা করে, তখন আপনা থেকেই তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়, ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জেগে ওঠে, অতপর এটিই তাদের একই নেতার আনুগত্য করার মনোভাব সৃষ্টি করে তোলে এবং তাদেরকে নিয়ম ও শৃংখলার শিক্ষা দান করে। এর ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, মমতাবোধ ও সমস্বার্থের অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠে। আমীর-গরীব, বড়-ছোট, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও তার চাপরাশী একই সাথে দাঁড়িয়ে যায়, উঁচু জাত ও নীচ জাত বলে কিছু থাকে না।

এ হচ্ছে সালাতের অসংখ্য কল্যাণের মধ্যে কয়েকটি। সালাতে আল্লাহর কোন লাভ নেই বরং তাতে মুসল্লীর কল্যাণ। মানুষের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা সালাত ফরয করে দিয়েছেন। সালাত আদায় না করলে তাঁর অসন্তোষ এ জন্য নয় যে, তাতে তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করছে, বরং এ জন্য যে, তারা তাতে নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কত বিপুল শক্তি আল্লাহ তা'য়ালা সালাতের মাধ্যমে দিয়েছেন, আর মানুষ তা গ্রহণ করার পথ এড়িয়ে চলেছে। মুখে আল্লাহর কর্তৃত্ব, রাসূলের আনুগত্য ও আখেরাতে হিসেব দেয়ার কথা স্বীকার করা হচ্ছে অথচ কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্ধারিত সর্বশ্রেষ্ঠ ফরযকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, এটা কত বড় লজ্জার কথা। এরূপ কাজের পেছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে ঃ হয় সে সালাতকে ফরয বলে স্বীকার করে না, অথবা সে তাকে ফরয জেনেও তা এড়িয়ে চলছে। অবশ্য করণীয় ফরযকে যদি অস্বীকার করা হয়, তা হলে কার্যত কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা) উভয়ের উপর মিথ্যা আরোপ করা হয় এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনার মিথ্যা দাবী করা হয়। আর যদি তাকে ফরয বলে স্বীকার করেও এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করা হয়, তাহলে সে নির্ভরের নিতান্ত অযোগ্য প্রমাণিত হবে এবং দুনিয়ার কোন ব্যাপারেও তার উপর নির্ভর করা যাবে না। যখন সে আল্লাহর

প্রতি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে অসাধুতার পরিচয় দিচ্ছে, তখন সে যে মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে অসাধুতার পরিচয় দেবে না, এরূপ প্রত্যাশা কি করা যায় ?

সওম

দ্বিতীয় ফরয হচ্ছে সওম। সওম কি ? সালাত যে শিক্ষা প্রতিদিন পাঁচবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সওম বছরে একবার তা একমাস ধরে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। রমযান এলে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানের খানাপিনা বন্ধ থাকে। সেহেরীর সময়ে তারা খানাপিনা করছিল, আযান হওয়া মাত্র তাদের হাত সংযত করলো। তারপর যত লোভনীয় খাদ্য তাদের সামনে আসুক, যতই ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাগুক, মন যতই প্রলুব্ধ হোক, সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কিছুই খেতে পারে না। এমন নয় যে, তারা লোকের সামনেই খাচ্ছে না, এমন কি যে জন শূন্য স্থানে দেখার মত কেউ নেই, সেখানেও এক বিন্দু পানি অথবা এক দানা খাদ্য গলধঃকরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ নিষেধ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে। যখনই মাগরিবের আযান হল, অমনি তারা ইফতারের দিকে ফিরে এল। তারপর সারা রাত যখন যা খুশী তারা নির্ভয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে খেতে পারে। ভেবে দেখা যাক, এটা কি জিনিস ? এর ভেতরে রয়েছে আল্লাহর ভীতি, তাঁর হাযির-নাযির থাকা সম্পর্কে মুসলমানদের প্রত্যয়, আখেরাতের জীবন ও আল্লাহর আদালতের উপর ঈমান ; কুরআন ও রাসূল (সা)-এর কঠোর আনুগত্য ; অবশ্য করণীয় কার্য সম্পর্কে বলিষ্ঠ অনুভূতি। এতে রয়েছে ধৈর্য সহকারে কর্মপ্রচেষ্টা ও বিপদের মুকাবিলা করার শিক্ষা। আরো রয়েছে আল্লাহর সন্তোষ বিধানের জন্য স্বকীয় প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ ও দমিত করার ক্ষমতা। প্রতি বছর রমযান আসে এবং পুরো ৩০ দিন ধরে এ সওম মুসলমানকে শিক্ষা দান করে, তাদের ভেতরে এসব গুণরাজি পয়দা করার চেষ্টা করে, যেন তারা পূর্ণরূপে ও সর্বোতভাবে মুসলমান হতে পারে এবং এ গুণরাজি তাদেরকে সেই ইবাদাতের যোগ্যতা দান করে ; যা এক মুসলমানকে আপন জীবনে রূপায়িত করতে হবে।

আরো দেখার বিষয়, আল্লাহ তা'য়ালা সকল মুসলমানের জন্য একই মাসে সওম ফরয করে দিয়েছেন, যেন আলাদা আলাদা সওম না রেখে সবাই মিলে এক সংগে সওম রাখে। এর মধ্যে আরো অসংখ্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সারা ইসলামী জনপদে এ একটি মাস পবিত্রতার মাস হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সারা মুসলিম দুনিয়া তখন ঈমান, আল্লাহ ভীতি, তাঁর হুকুমের আনুগত্য, পাক-পবিত্র আচরণ ও সৎকর্মে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ সময়ে সর্বপ্রকার দুষ্কৃতি দমিত হয় এবং সৎকর্মকে উৎসাহিত করা হয়। সৎলোকেরা সৎকর্ম করতে পরস্পরকে সহায়তা করে থাকেন। অসৎ লোকেরা দুষ্কর্ম্য করতে লজ্জা বোধ করে। ধনীর মধ্যে দরিদ্রকে সাহায্য করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা

হয়। সকল মুসলমান একই অবস্থায় ফিরে আসে এবং এ একই অবস্থায় এসে তারা অনুভব করে যে মুসলমান সব এক জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ হচ্ছে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সমবেদনার ও আভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক কার্যকরী পন্থা।

এ হচ্ছে আমাদেরই জন্য কল্যাণ। আমাদেরকে ক্ষুধিত রেখে আল্লাহর কোন লাভ নেই। আমাদেরই কল্যাণের জন্য তিনি আমাদের উপর সওম ফরয করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন সংগত কারণ ব্যতীত এ ফরয পালনে বিরত থাকে, সে নিজেরই উপর যুলুম করে। রমযানের দিনে যারা প্রকাশ্যে খানাপিনা করে, তারাই সবচেয়ে লজ্জাজনক পন্থা অনুসরণ করে চলে। তারা কার্যত প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, তারা মুসলিম জামায়াতের মধ্যে শামিল নয়, ইসলামের আদেশ নিষেধের জন্য তাদের কোন পরওয়া নেই, যাকে তারা আল্লাহ বলে মানে তার আনুগত্যের পথ থেকেও তারা প্রকাশ্যে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাহলে যেসব লোক নিজস্ব জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে যায়, যারা তাদের স্রষ্টা ও অন্নদাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না, যারা তাদের দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার নির্ধারিত আইনকে প্রকাশ্যে লংঘন করে, তাদের কাছে কোন ব্যক্তি নির্ভরযোগ্যতা, সদাচারণ, আমানতদারী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও আইনানুগত্যের প্রত্যাশা করতে পারে কি?

যাকাত

তৃতীয় ফরয হচ্ছে যাকাত। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক ধনশালী মুসলমানের উপর ফরয করে দিয়েছেন যে, তার কাছে কমপক্ষে চল্লিশ টাকা থাকলে এবং তা পুরো এক বছর জমা থাকলে সে তার ভেতর থেকে এক টাকা কোন গরীব আত্মীয়, কোন অভাব-গ্রস্ত, মিসকীন, নও-মুসলিম, মুসাফির অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান করবে।[১]

এমনি করে আল্লাহ তা'য়ালা ধনশীল লোকদের সম্পদে গরীবদের জন্য অন্তত শতকরা আড়াই ভাগ অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[২] এর চেয়ে যদি কেউ বশী দান করেন, তাহলে তা অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার জন্য আরো বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে।

---

১. যাকাত কেবল টাকার উপরই নির্ধারিত হয়নি বরং সোনা-রূপা, পণ্যদ্রব্য ও গো-মহিষের উপরও ধরা হয়েছে। এসব জিনিসের উপর যাকাতের পরিমাণ ফিকাহর কিতাব সমূহে বিস্তারিত লেখা রয়েছে। এখানে কেবল যাকাত সংক্রান্ত জ্ঞান ও তার কল্যাণকর দিকগুলোর আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সেই কারণে এখানে কেবল টাকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে।

২. এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজ বংশ সৈয়দ ও হাশেমীদের জন্য যাকাত হারাম করে দিয়েছেন। অর্থাৎ বনী হাশেমদের পক্ষে যাকাত দান করা ফরয, কিন্তু তাদের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি কোন গরীব সৈয়দকে সাহায্য করতে চান, তিনি তাকে হাদিয়া বা তোহফা হিসেবে দান করতে পারেন, ছদকা খয়রাত বা যাকাত হিসেবে দিতে পারেন না।

এ বাবদ যে অংশটা দেয়া হচ্ছে, তা আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌঁছে না। তিনি আমাদের কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি বলেন ঃ তোমরা যদি খুশী মনে আমার খাতিরে তোমাদের কোন গরীব ভাইকে কিছু দান কর তাহলে যেন আমাকেই দান করলে। তার পক্ষ থেকে আমি তোমায় কয়েক গুণ বেশী প্রতিদান দেব। অবশ্যি শর্ত হচ্ছে তাকে দিয়ে তুমি কোন অনুগ্রহ প্রদর্শনের দাবী করবে না, তাকে গাল-মন্দ বা ঘৃণা করবে না, তার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করবে না, লোক তোমার দানের আলোচনা করুক বা অমুক সাহেব মস্ত বড় দাতা বলে তোমার প্রশংসা করুক, এমন কোন চেষ্টাও তুমি করবে না। যদি তুমি এসব অপবিত্র ধারণা থেকে তোমার মন মুক্ত রাখতে পার, কেবল আমারই সন্তোষের জন্য যদি নিজের দৌলত থেকে গরীবকে অংশ দান কর, তাহলে আমার অনন্ত দৌলত থেকে আমি তোমায় এমন অংশ দেব যা কখনও শেষ হয়ে যাবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা সালাত-সওম যেমন আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন, যাকাতকেও ঠিক তেমনি ফরয করে দিয়েছেন। যাকাত ইসলামের একটি বড় স্তম্ভ। একে স্তম্ভ এ কারণে বলা হয় যে, এদ্বারা মুসলমানের মধ্যে কুরবানী ও আত্মত্যাগের শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বার্থপরতা, কৃপণতা সংকীর্ণমনতা ও সম্পদ পূজার দোষসমূহ দূর হয়ে যায়। লক্ষ্মীর পূজারী ও অর্থের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত লোভী ও কৃপণ ব্যক্তি ইসলামের কোন কাজে আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমে নিজের কায়িক পরিশ্রমে উপার্জিত সম্পদ কোন স্বার্থের তাকিদ ছাড়াই কুরবান করে দিতে পারে, সে-ই চলতে পারে ইসলামের সহজ-সরল পথে। যাকাত মুসলমানকে এ কুরবানী দিতে অভ্যস্ত করে তোলে এবং তাদেরকে এমন যোগ্যতা দান করে যে, যখনই আল্লাহর পথে তার সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন হয় তখন সে আপন সম্পদকে বুকে আঁকড়ে বসে থাকে না, বরং অন্তর খুলে দিয়ে ব্যয় করে।

যাকতের পার্থিব কল্যাণ হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে মুসলমানগণ পরস্পরকে সাহায্য করে। কোন মুসলমান বস্ত্রহীন, অন্নহীন, অপমানিত ও উপেক্ষিত হয়ে থাকবে না। আমীর গরীবকে এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যাতে তাকে ভিক্ষা করে ফিরতে না হয়। কোন ব্যক্তি কেবল নিজের আয়েশ-আরাম নিজস্ব শান-শওকতের জন্য তার সম্পদ ব্যয় করে উড়িয়ে দেবে না, বরং সে স্মরণ রাখবে যে, তার কওমের ইয়াতীম, বিধবা ও অভাবগ্রস্তদের হক (অধিকার) রয়েছে। এমন সব ছেলেমেয়েদেরও অধিকার আছে তাতে, যারা আল্লাহর কাছ থেকে মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে অথচ গরীব বলে শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। তাদেরও অধিকার আছে যারা রুগ্ন-অকর্মন্য

বলে কোন কাজ করতে পারছে না। এ অধিকার যারা মেনে নিতে রাজী হয় না, তারা যালেম। একজন লোক বস্তার পর বস্তা টাকায় বোঝাই করবে, দালান-কোঠায় আরাম-আয়েশ উপভোগ করবে হাওয়া গাড়িতে চলে বিলাস-ভ্রমণ করবে, তারই কওমের হাযার হাযার লোক দু'মুঠো ভাতের জন্য ভিক্ষা করে ফিরবে, হাযার হাযার কর্মক্ষম লোক বেকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকবে, এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি হতে পারে। ইসলাম এ ধরনের স্বার্থপরতার দুশমন। কাফেরদের সভ্যতা তাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যা কিছু সম্পদ তাদের হাতে আসে, তা তারা জমিয়ে রাখবে এবং তা সুদের ভিত্তিতে কর্জ দিয়ে আশেপাশের লোকদের উপার্জিত অর্থও তারা টেনে আনবে আপন মুঠিতে। পক্ষান্তরে মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীন-ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা যদি তাদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ দান করেন, তবে তা জমিয়ে রাখবে না, বরং অন্যান্য ভাইকে তা দিয়ে সাহায্য করবে, যাতে তাদের প্রয়োজনের চাহিদা মিটিয়ে নিজেদের মত তাদেরকেও উপার্জনক্ষম করে তোলা যায়।

হজ্জ

চতুর্থ ফরয হচ্ছে হজ্জ। মুসলমানদের জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা জরুরী। তাও কেবল এমন লোকের জন্য জরুরী, যে মক্কা মোয়াযযমা পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয় বহন করতে সক্ষম।

এখন যেখানে মক্কা মোয়াযযমা অবস্থিত, কয়েক হাযার বছর আগে সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তৈরী করেছিলেন একটি ছোট্ট ঘর। আল্লাহ তাঁর আন্তরিকতা ও প্রেমের স্বীকৃতি স্বরূপ সেই ঘরটিকে আপন ঘর বলে স্বীকার করে নিয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, ইবাদাত করতে গিয়ে আমরা যেন সেই ঘরের দিকে মুখ করি এবং আরো নির্দেশ দিলেন যে, দুনিয়ার যেখানকার বাসিন্দাই হোক, প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমান যেন সারা জীবনে অন্তত একবার তেমনি প্রেমসহকারে এ ঘর যিয়ারতের জন্য আসে ও তাকে প্রদক্ষিণ করে, যেমনি করে তাঁর প্রিয় বান্দাহ ইবরাহীম (আ) এ ঘর প্রদক্ষিণ করতেন। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন যে, যখন কেউ তাঁর ঘরের দিকে আসবে, তখন তার দিলকে পবিত্র করতে হবে, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে, খুন-খারাবী, দুষ্কৃতি ও অশ্লীল ভাষণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং প্রভুর দরবারে যেভাবে হাযির হওয়া প্রয়োজন তেমনি আদব, ভক্তি বিনয় সহকারে হাযির হতে হবে। মনে করতে হবে যে তারা সেই বাদশাহের সামনে হাযির হতে যাচ্ছে, যিনি যমীন ও আসমানের নিয়ামক, যাঁর সামনে সকল মানুষই দুঃস্থ। এমনি বিনয়ের সাথে যখন সেখানে হাযির হয়ে পরিশুদ্ধ অন্তরে ইবাদাত করা যাবে, তখন তিনি তাদেরকে আপন অনুগ্রহে সমৃদ্ধ করে দেবেন।

একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগিতে দেখলে, হজ্জ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। মানুষের দিলের মধ্যে আল্লাহর প্রেম না থাকলে কি করে সে নিজস্ব কাজ-কারবার ছেড়ে দিয়ে, প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এত বড় দীর্ঘ সফরের ক্লেশ স্বীকার করে নেবে ? মানুষ এ সফরের পথ ধরলে তাকে সে সাধারণ সফর হিসেবে মনে করে না। এ সফরে তার মনোযোগ সবচেয়ে বেশী করে নিবদ্ধ থাকে আল্লাহর দিকে। তার অন্তরে কোন সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না। কা'বার যত নিকটবর্তী হয়, ততই তার অন্তরে বেশী করে জ্বলতে থাকে প্রেমের অগ্নিশিখা। দুষ্কৃতি ও না-ফরমানীকে তার দিলে আপনা থেকেই ঘৃণা করতে থাকে। অতীত দুষ্কৃতির জন্য তার মনে জাগ্রত হয় লজ্জার ভাব। ভবিষ্যতের জন্য সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আনুগত্যের তাওফীক। ইবাদাত ও আল্লাহর যিক্‌রের আস্বাদ সে লাভ করে। আল্লাহর হুযুরে তার সিজদা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে এবং তার সামনে সিজদা থেকে মাথা তুলতেই চায় না তার মন। কুরআন পাঠে তার অন্তরে আসে নতুনতর আনন্দ এবং সওম পালনে তার মধ্যে আসে এক নতুনতর ভাবের অনুভূতি। যখন সে হেজাযের সরযমীনে পদক্ষেপ করে, তখন তার অন্তরের পর্দায় ভেসে উঠে ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসের সকল দৃশ্য। সর্বত্র সে দেখতে পায় আল্লাহর প্রেমিক ও তাঁরই উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগী মানুষদের চিহ্ন। সেখানকার প্রতিটি বালুকণা ইসলামের গৌরব-গরিমার সাক্ষ্য বহন করে এবং সেখানকার প্রতিটি কাঁকর ঘোষণা করে, এ সেই দেশ যেখানে ইসলাম জন্মলাভ করেছিল এবং সেখান থেকে আল্লাহর বাণী ঘোষিত হয়েছিল। এমনি করেই মুসলমানের দিল পরিপূর্ণ হয় আল্লাহর প্রেম ও ইসলামের প্রীতিতে এবং সেখান থেকে সে এমন এক গভীর প্রভাব নিয়ে ফিরে আসে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত যা কখনো মুছে যায় না।

হজ্জের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনের সাথে সাথে দুনিয়ারও অসংখ্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। হজ্জকে উপলক্ষ্য করে মক্কাকে করে দেয়া হয়েছে তামাম দুনিয়ার মুসলমানের এক কেন্দ্রভূমি। দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে আল্লাহর স্মরণকারীরা একই সময়ে সেখানে সমবেত হয়, একে অপরের সাথে মিলিত হয়। পরস্পরের মধ্যে ইসলামী সমতা ও প্রীতি কায়েম হয় এবং সকলের দিলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মুসলমান যে দেশের বাসিন্দাই হোক আর যে বংশেই জন্ম লাভ করুক—পরস্পর ভাই ভাই ও একই কওমের অন্তর্গত। এ কারণে হজ্জ একদিকে আল্লাহর ইবাদাত অপরদিকে তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের এক সম্মেলন এবং মুসলমানদের মধ্যে এক শক্তিশালী ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে তোলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমও হচ্ছে এ হজ্জ।

ইসলামের সহায়তা

সর্বশেষ যে ফরয আমাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত হয়েছে, তাহচ্ছে ইসলামের সহায়তা (হেমায়াতে ইসলাম) এ ফরযটি যদিও ইসলামের স্তম্ভসমূহের অন্তর্গত নয়, তথাপি ইসলামী ফরযসমূহের মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামের সহায়তা কি এবং কেন তা ফরয করা হল, একটি দৃষ্টান্ত থেকে তা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারা যায়। ধরা যাক, এক ব্যক্তির সাথে আমার বন্ধুত্ব রয়েছে অথচ প্রত্যেক ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমার প্রতি তার কোন সমবেদনা নেই। সে আমার লাভ-ক্ষতির কোন পরওয়াই করে না। যে কাজে আমার ক্ষতি হবে নিজ স্বার্থের জন্য সে তা বিনা দ্বিধায় করে যায়। যে কাজে আমার লাভ তাতে সে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে কেবল এ জন্য যে, তাতে তার নিজের কোন লাভ নেই। আমার কোন বিপদ এলে সে সাহায্য করে না কোথাও আমার অনিষ্ট করা হচ্ছে দেখলে সে নিজেও অনিষ্টকারীদের সাথে শরীক হয়, অথবা অন্তত আমার ক্ষতির কথাটা সে চুপ করে শুনে যায়। আমার দুশমন আমার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে তাদের সাথে শরীক হয়, অথবা অন্তত তাদের দুষ্কৃতি থেকে আমাকে বাঁচবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করে না। এমন লোককে কি সত্যিই আমি বন্ধু বলে মনে করব? সকলেই বলবে ঃ কখনো না। কারণ এ হচ্ছে কেবল বন্ধুত্বের মৌখিক দাবী, প্রকৃতপক্ষে তার অন্তরে বন্ধুত্ব ভাব নেই। বন্ধুত্বের মানে হচ্ছে মানুষ যার বন্ধু হবে, তার প্রতি প্রেম ও আন্তরিকতা পোষণ করবে, তার প্রতি সমবেদনাশীল ও তার শুভানুধ্যায়ী হবে। দুশমনদের মুকাবিলায় তাকে সাহায্য করবে, তার নিন্দা সে সহ্য করবে না। এসব বিশেষত্ব তার মধ্যে না থাকলে সে মুনাফিক। তাঁর বন্ধুত্বের দাবী মিথ্যা।

এ দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মনে করা যায়, যখন কেউ মুসলমান হওয়ার দাবী করে, তখন তার উপর কি কি কর্তব্য নির্ধারিত হয়? মুসলমান হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঃ যে মুসলমান হচ্ছে তার মধ্যে ইসলামী উদ্দীপনা থাকবে, ঈমানী আত্মমর্যাদা-বোধ থাকবে, ইসলামের প্রীতি ও মুসলমান ভাইদের জন্য সত্যিকার শুভ কামনা থাকবে। এমন কি, সে যখন দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখনো হামেশা তার দৃষ্টির সম্মুখে থাকবে ইসলামের কল্যাণ ও মুসলমানদের হিতাকাংখা। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অথবা কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি থেকে বাঁচবার জন্য এমন কোন কাজ সে করবে না, যা ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর ও মুসলমানদের কল্যাণ বিরোধী হবে। মন, প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে এমন প্রত্যেকটি কাজে সে অংশ নেবে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণকর এবং এমন প্রত্যেকটি কাজ থেকে সে দূরে থাকবে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে

অনিষ্টকারী। নিজের দ্বীন ও দ্বীনী জামায়াতের সম্মান সে মনে করবে নিজের সম্মান। যেমন সে নিজের অবমাননা বরদাশত করতে পারে না, তেমনি ইসলাম ও ইসালামের বিশ্বাসীদের অবমাননাও বরদাশত করবে না। যেমন সে তার নিজের বিরুদ্ধে দুশমনদেরও সহায়তা করবে না, তেমনি ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদেরও সহায়তা করবে না। যেমন করে সে নিজের ধন, প্রাণ ও সম্মান রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত, তেমনি ইসলাম ও মুসলিম জামায়াতের জন্যও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে। যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার দাবী রাখে, তার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় সে মুনাফিকদের মধ্যেই গণ্য হবে। তার কার্যকলাপই তার মৌখিক দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করবে।

এ ইসলামের সহায়তায় একটি বিভাগকে শরীয়াতের ভাষায় বলা হয় 'জিহাদ'। জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোন কাজে নিজের শেষ শক্তি পর্যন্ত ব্যয় করে দেয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি অর্থ দ্বারা, কথা দ্বারা, কলম দ্বারা, হাত-পা দ্বারা আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করার চেষ্টা করতে থাকে, সে-ও জিহাদই করছে। 'জিহাদ' শব্দটি সেই যুদ্ধের বেলাই ব্যবহার করা হয়েছে, যা সকল প্রকার পার্থিব লক্ষ্য থেকে মুক্ত করে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে চালিত হয়। শরীয়াতে এ জিহাদকে ফরযে কেফায়া বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ হচ্ছে এমন ফরয, যা সকল মুসলমানের উপর নির্ধারিত হয়েছে বটে ; কিন্তু একটি জামায়াত এ কর্তব্য পালন করলে তাতে অবশিষ্ট লোকদেরও এ দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়। অবশ্যি কোন ইসলামী দেশের উপর দুশমনের হামলা হলে সেই পরিস্থিতিতে জিহাদ সেই দেশের সকল বাসিন্দার জন্যই সালাত-সওমের মত ফরযে-আইন বা অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে। যদি তারা দুশমনের মুকাবিলা করার শক্তি না রাখে, তাহলে তাদের নিকটবর্তী দেশসমূহের প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয হয়ে পড়ে যে, সে তার জান-মাল দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করবে ; আর যদি তাদের সাহায্য নিয়েও দুশমনের হামলা প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য তাদের সহায়তা করা সালাত-সওমের মতই অবশ্য পালনীয় ফরয হয়ে যায়। একটি লোকও এ অবশ্য কর্তব্য পালনে পশ্চাদপদ হলে গুনাহগার হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদের গুরুত্ব সালাত-সওমের চেয়েও বেশী হয়ে থাকে, কারণ তখন হচ্ছে ঈমানের পরীক্ষার সময়। যে ব্যক্তি বিপদের মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন না করে, তার ঈমান সম্পর্কেই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তার সালাত কি কাজে লাগবে, আর তার সওমে-ই বা কি লাভ ? আর এ সময়ে যদি কোন হতভাগ্য ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুশমনদের পক্ষ সমর্থন করে তবে সে হচ্ছে নিশ্চিতরূপে মুনাফিক ; তার সালাত-সওম, তার যাকাত, তার হজ্জ—সবকিছুই অর্থহীন।

দ্বীন ও শরীয়াত

এ যাবত আমি যা কিছু বলেছি, তা হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে কথা। এখন আমি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর শরীয়াত সম্পর্কে কথা বলব। তবে সবার আগে জেনে নিতে হবে ঃ শরীয়াত কাকে বলে, আর শরীয়াত ও দ্বীনের মধ্যে পার্থক্যই বা কি ?

দ্বীন ও শরীয়াতের পার্থক্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বলা হয়েছে যে, সকল নবীই ইসলামের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, আর দ্বীন-ইসলাম হচ্ছে ঃ আল্লাহর সত্যিকার পয়গাম্বরগণের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণরাজি এবং আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি ঈমান পোষণ করা, আল্লাহর কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া, সব মনগড়া পথ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কিতাবসমূহের নির্ধারিত পথকেই সত্য বলে উপলব্ধি করা, আল্লাহর পয়গাম্বরগণের আনুগত্য করা এবং সবকিছুকে ছেড়ে তাঁদেরই অনুসরণ করা। ইবাদাতে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা যেতে পারে না। এ ঈমান ও ইবাদাতের নাম হচ্ছে দ্বীন এবং সকল নবীর শিক্ষার মধ্যেই একে শামিল করা হয়েছে।

এ ছাড়া আর একটি জিনিস হচ্ছে শরীয়াত। ইবাদাতের পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক লেন-দেন ও সম্বন্ধ রক্ষার বিধান, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েযের সীমা প্রভৃতি শরীয়াতের মধ্যে শামিল। এসব বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা গোড়ার দিকে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কওমের অবস্থা বিবেচনা করে নিজ পয়গাম্বরদের মারফতে বিভিন্ন শরীয়াত প্রেরণ করেছিলেন, যাতে প্রত্যেক কওমকে আলাদা আলাদা করে সদাচরণ, সভ্যতা ও সচ্চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে অভ্যস্ত করে এক বৃহত্তর আইনের আনুগত্য করার জন্য তৈরী করে তোলা যায়। মানুষকে তৈরী করে তোলার এ কাজটি যখন সম্পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে পাঠালেন সেই বৃহত্তর বিধান দিয়ে, যার প্রত্যেকটি ধারা তামাম দুনিয়ার জন্য প্রযোজ্য। এখন দ্বীন তো সেই একই থাকলো, যা পূর্ববর্তী নবীরা শিখিয়ে গেছেন, কিন্তু পূর্ববর্তী সব শরীয়াতই বাতিল হয়ে গেল। তার পরিবর্তে কায়েম হল এমন এক শরীয়াত, যাতে সকল মানুষের জন্য ইবাদাতের পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি পারস্পরিক আদান প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন এবং হালাল-হারামের সীমা সবই একসাথে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

শরীয়াতের বিধান জানার মাধ্যম

শরীয়াতে মুহাম্মাদীর নীতি ও বিধান বুঝার জন্য আমাদের সামনে দু'টি মাধ্যম রয়েছে। প্রথম হচ্ছে কুরআন মজীদ, আর দ্বিতীয় হাদীস। কুরআন মজীদ সম্পর্কে সকলেই জানেন যে, তা হচ্ছে আল্লাহর কালাম এবং তার প্রতিটি শব্দ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। হাদীস বললে বুঝায় সেসব বর্ণনা, যা রাসূলে করীম (সা) থেকে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সারা জীবনই ছিল কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা। নবী হওয়ার সময় থেকে শুরু করে তেইশ বছর কাল তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে মানুষকে শিক্ষা ও পথ নির্দেশ (হেদায়াত) দানের কাজে এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জী অনুযায়ী জীবন যাপনের পদ্ধতি তিনি মানুষকে শিখিয়ে গেছেন তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে। তাঁর এ কর্মব্যস্ত জীবনে তাঁর সংগী নর-নারী তাঁর স্বজনগণ ও সহধর্মিনীগণ যত্ন সহকারে তাঁর প্রতিটি কথা শুনতেন, প্রতিটি কাজের উপর নযর রাখতেন এবং যে কোন সমস্যা তাদের সামনে হাযির হলে তাঁর কাছ থেকে শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে নির্দেশ গ্রহণ করতেন। কখনো তিনি বলতেন ঃ অমুক কাজ কর এবং অমুক কাজ কর না। যারা সেখানে হাযির থাকতেন তারা তাঁর নির্দেশ যত্ন সহকারে শিখে নিতেন। এমনি করে কখনো তিনি কোন কাজ এক বিশেষ পদ্ধতিতে করতেন। যারা দেখতেন, তারা তাও মনে করে রাখতেন এবং যারা দেখতেন না তাদেরকেও তারা বলে দিতেন যে, নবী করীম (সা) অমুক কাজ অমুক পদ্ধতিতে করেছেন। আবার কখনো কোন ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর সামনে কোন কাজ করতেন, তিনি হয় চুপ থাকতেন, নয় তো তা অনুমোদন করতেন, অথবা নিষেধ করতেন। এ ধরনের কথাগুলোও মানুষ সংরক্ষিত করে রেখেছে। এমনি যেসব কথা তাঁর সংগী নর-নারীদের কাছ থেকে মানুষ শুনছে, কেউ তা মুখস্থ করে রেখেছে, আবার কেউ তা লিখে রেখেছে। এবং যার কাছ থেকে কথাটি তাদের কাছে এসেছে, তার নামও স্মরণ রেখেছে। ক্রমে ক্রমে এসব বর্ণনা পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়েছে। এমনি করে এক বিরাট হাদীস সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। এসব হাদীস সংগ্রাহকদের মধ্যে ইমাম মালিক (র), ইমাম বুখারী (র), ইমাম মুসলিম (র), ইমাম তিরমিযী (র), ইমাম আবু দাউদ (র), ইমাম নাসায়ী (র) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র) কর্তৃক সংগৃহীত হাদীসের কিতাবসমূহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

ফিকাহ

কুরআন ও হাদীসের বিধান সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সাধারণ লোকদের সুবিধার জন্য আইনসমূহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের লিখিত গ্রন্থরাজিকে বলা হয় 'ফিকাহ'। যেহেতু প্রত্যেক মানুষই

কুরআন শরীফের সবগুলো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারে না এবং প্রত্যেকটি মানুষ হাদীস সংক্রান্ত বিদ্যায় এতটা পারদর্শী নয়, যাতে নিজেরা শরীয়াতের বিধান বুঝে নিতে পারে, তাই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বছরের পর বছর মেহনত করে, চিন্তা-গবেষণা করে 'ফিকাহ' শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। দুনিয়ার মুসলমান তাদের সে কল্যাণকর কার্যের প্রতিদান কখনো দিতে পারবে না। তাঁদের মেহনতের ফলে আজ কোটি কোটি মুসলমান কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার না করে শরীয়াতের আনুগত্য করে যাচ্ছে এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিধান উপলব্ধি করতে তাদের কোন অসুবিধাই হচ্ছে না।

গোড়ার দিকে বহু ধর্মনেতা নিজ নিজ পদ্ধতিতে 'ফিকাহ' শাস্ত্র প্রণয়ন করে গেছেন ঃ কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ফিকাহ' সংক্রান্ত চারিটি তরীকা দুনিয়ায় স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং আজ দুনিয়ার মুসলমান সবচেয়ে বেশী করে তাঁদেরই আনুগত্য করে যাচ্ছে ঃ

এক ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) কর্তৃক রচিত ফিকাহ। এর রচনায় ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ইমাম যুফার (র) প্রভৃতি কতিপয় বড় বড় ওলামার সহযোগিতা ছিল। একে হানাফী ফিকাহ বলা হয়।

দুই ঃ ইমাম মালেক (র) কর্তৃক রচিত ফিকাহ। একে বলা হয় মালেকী ফিকাহ।

তিন ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক রচিত ফিকাহ। এর নামকরণ হয়েছে শাফেয়ী ফিকাহ।

চার ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) কর্তৃক রচিত ফিকাহ। একে বলা হয় হাম্বলী ফিকাহ।

এ চার রকমের ফিকাহ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর দু'শো বছরের মধ্যে রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে যেটুকু পারস্পরিক বৈষম্য দেখা যায়, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিভিন্ন লোক যখন কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন অথবা তার তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, তখন তাঁদের গবেষণা ও উপলব্ধির মধ্যে কমবেশী করে বৈষম্য থাকা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যেহেতু তারা সবাই সত্যানুসন্ধিৎসু, সদুদ্দেশ্যপ্রনোদিত ও মুসলমানদের সত্যিকার কল্যাণকামী ধর্মনেতা ছিলেন, তাই সকল মুসলমান এ চার রকমের ফিকাহকেই সত্যাশ্রিত বলে মেনে নিয়েছে।

অবশ্যি জেনে রাখা দরকার যে, একই ব্যাপারে মাত্র একই তরীকার আনুগত্য করা যেতে পারে ; চার বিভিন্ন তরীকার আনুগত্য করা চলতে পারে না। এ কারণে বেশীর ভাগ ওলামার মত এই যে, মুসলমানদের এ চার

তরীকার যে কোন একটির আনুগত্য করা প্রয়োজন। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর ওলামা বলে থাকেন যে, কোন বিশেষ ফিকাহর আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই। আলেমদের আন্তরিকতা সহকারে কুরআন ও হাদীসের বিধান বুঝে নেয়া প্রয়োজন, আর যারা এলেমের অধিকারী নন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের আস্থাভাজন কোন আলেমের আনুগত্য করা। এদেরকে বলা হয় আহলে হাদীস। এরাও উপরিউক্ত চার শ্রেণীর মতই সত্যাশ্রয়ী।

তাসাউফ

ফিকাহর সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, আমাকে যেভাবে, যে পদ্ধতিতে কোন কাজ করার বিধান দেয়া হয়েছে, সঠিকভাবে তা করছি কিনা। যদি তা সঠিকভাবে পালন করে থাকি, তা হলে মনের অবস্থা কি ছিল, তা নিয়ে ফিকাহর কিছু বলবার নেই। মনের অবস্থার সাথে যার সম্পর্ক সে জিনিসটিকে বলা হয় তাসাউফ[১], যেমন কেউ সালাত আদায় করছে, সেখানে ফিকাহ্ কেবলমাত্র এতটুকুই দেখছে যে, সে ঠিক মত ওযু করল কিনা, কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কিনা, সালাতের সবগুলো অপরিহার্য শর্ত পালন করল কিনা, সালাতের মধ্যে যা কিছু পড়তে হয় তা সে পড়ল কিনা এবং যে সময়ে যে কয় রাকায়াত সালাত নির্ধারিত রয়েছে, ঠিক সেই সময়ে তত রাকায়াত পড়ল কিনা। যখন এর সবগুলো শর্ত পালন করা হল তখন ফিকাহর দৃষ্টিতে তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এক্ষেত্রে তাসাউফ দেখে যে, এ ইবাদাতে তার দিলের অবস্থা কি ছিল? সে আল্লাহর দিকে নিবিষ্টচিত্ত ছিল কিনা? তার দিল পার্থিব চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত ছিল কিনা? সালাত থেকে তার অন্তরে আল্লাহর ভীতি, তাঁর হাযির-নাযির থাকা সম্পর্কে প্রত্যয় এবং একমাত্র তাঁরই সন্তোষ বিধানের আকাংখ্যা পয়দা হয়েছিল কিনা? এ সালাত তার আত্মাকে কতটা পরিশুদ্ধ করেছে? তার চরিত্র কতটা সংশোধন করেছে? তাকে কতটা সত্যসাধক ও সৎকর্মশীল মুসলিম করে তুলেছে? সালাতের সত্যিকার লক্ষ্যের পথে যেসব বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে, একজন লোক তার যতটা পরিপূর্ণতা হাসিল করল, তাসাউফের দৃষ্টিতে তার সালাত ততটা বেশী পূর্ণতা লাভ করেছে। আর সে দিক দিয়ে যতটা দুর্বলতা থেকে যাবে, তারই জন্য তার সালাতকেও ততটা দুর্বল বলে ধরা হবে। এমনি করে শরীয়াতে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, তার সবকিছুকেই ফিকাহ্ কেবল এতটুকুই দেখে যে, যে হুকুম যেভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই হুকুম ঠিক সেই পদ্ধতিতে পালন করা হল কিনা। অন্যদিকে তাছাউফ দেখে সেই হুকুম পালনের ব্যাপারে তার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা, সৎসংকল্প ও সত্যিকার আনুগত্যের মনোভাব বর্তমান ছিল।

---

১. কুরআন শরীফে এ জিনিসটির নাম দেয়া হয়েছে 'তাযকিয়া' ও 'হেকমত' হাদীসে একে বলা হয়েছে 'ইহসান' এবং পরবর্তী লোকেরা একে অভিহিত করেছেন 'তাসউফ' নামে।

একটি দৃষ্টান্ত থেকে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা যায়। যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি কারো সাথে সাক্ষাত করে তখন সে দু'টি দৃষ্টিভংগিতে তার প্রতি নযর করে। এক হচ্ছে ঃ লোকটি পূর্নাংগ ও স্বাস্থ্যবান কিনা ; অন্ধ, কানা, খোড়া তো নয়। লোকটি শুশ্রী বা কুশ্রী; তার পরিধানে ভাল কাপড়-চোপড়, না ময়লা জীর্ণ কাপড়, দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ তার চরিত্র কি ধরনের, তার স্বভাব ও অভ্যাস কিরূপ, তার জ্ঞান-বুদ্ধি কি প্রকারের। সে আলেম না জাহেল, সৎ না অসৎ। এর মধ্যে প্রথম নযরটি হচ্ছে ফিকাহর নযর, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাসাউফের নযর। বন্ধুত্বের জন্য যখন কোন লোককে কেউ পসন্দ করতে চেষ্টা করবে, তখন তারা ব্যক্তিত্বের দু'টি দিকই যাচাই করে দেখতে হবে। তার ভেতর ও বাইরের দু'টি দিকই সুন্দর হোক এ হবে তার আকাংখা। এমনি করে ইসলামেও যে বাঞ্ছিত জীবনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে বাইরের ও ভিতরের উভয়বিধ বিশ্বাসের দিক দিয়ে শরীয়াতের বিধি-বিধানের আনুগত্য করতে হবে। কোন ব্যক্তির বাইরের আনুগত্য আছে অথচ অন্তরের আনুগত্যের প্রাণবস্তু নেই, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুন্দর চেহারার মৃত ব্যক্তির মত। আবার যে ব্যক্তির কার্য-কলাপে যাবতীয় সৌন্দর্য মওজুদ রয়েছে অথচ বাইরের আনুগত্য সঠিকভাবে করা হচ্ছে না, তার তুলনা চলে ঐ ব্যক্তির সাথে, যে অত্যন্ত শরীফ ও সৎকর্মশীল, অথচ শারীরিক দিক দিয়ে কুশ্রী ও বিকলাংগ।

এ দৃষ্টান্ত থেকে ফিকাহ্ ও তাসাউফের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, পরবর্তী যামানায় যেখানে জ্ঞান ও চরিত্রের বিকৃতি হেতু বহুবিধ অনাচার জন্ম লাভ করেছে সেখানে তাসাউফের পবিত্র রূপকেও বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। বিভ্রান্ত জাতিসমূহের কাজ থেকে ইসলাম বিরোধী দর্শনের শিক্ষা লাভ করে মানুষ তাকে তাসাউফের নামে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে নিয়েছে। কুরআন ও হাদীসে যার অস্তিত্ব নেই, এমনি বহু বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি তারা তাসাউফের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে শরীয়াতের আনুগত্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তাঁদের মতে তাসাউফের সাথে শরীয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে আর ভিন্নতর জগত বিরাজ করছে। সুফীদের আইন ও নিয়ম-পদ্ধতির আনুগত্য করার প্রয়োজন কি ? জাহেল সুফীরাই এ ধরনের মত পোষণ করে থাকে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপ্রসূত। শরীয়াতের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক থাকবে না, ইসলামে এমন কোন তাসাউফের স্থান নেই। কোন সুফীরই সালাত, সওম, হজ্জ ও যাকাতের আনুগত্য থেকে মুক্তি লাভের অধিকার নেই। সমাজ-জীবন, নৈতিক দায়িত্ব, চরিত্র, পারস্পরিক

আদান-প্রদান, অধিকার, কর্তব্য ও হালাল-হারামের সীমানা সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন্ কোন সুফীরই সেই নিয়মের বিরোধী কার্যকলাপের অধিকার নেই। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য করে না এবং তাঁর নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করে না, মুসলিম সুফী বলে পরিচয় দেয়ার যোগ্য সে নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকার প্রেমই হচ্ছে তাসাউফ এবং প্রেমের দাবী হচ্ছে এই যে, কেউ যেন আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়। ইসলামী তাসাউফ শরীয়াত থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়, বরং শরীয়াতের বিধানসমূহকে সর্বাধিক আন্তরিকতা ও সৎসংকল্প সহকারে পালন করা এবং অন্তরের ভিতরে আল্লাহর প্রেম ও ভীতির মনোভাব সঞ্চার করার নামই হচ্ছে তাসাউফ।

শরীয়াতের বিধি-বিধান

এ সর্বশেষ অধ্যায়ে আমি শরীয়াতের নীতি ও বিশেষ বিশেষ বিধান-সমূহের কথা বলব। তা থেকে বুঝতে পারা যাবে, ইসলামী শরীয়াত কিভাবে মানুষের মনকে সুষ্ঠু-সুন্দর বিধানের অনুগত করে দেয় এবং সে বিধানগুলো কতটা জ্ঞানগর্ভ।

শরীয়াতের নীতি

প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝতে পারে যে, সে বহুবিধ শক্তি নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে এবং তার ভিতরের প্রতিটি শক্তির দাবী হচ্ছে এই যে, সে তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবে। তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছা, আকাংখা, বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, রসাস্বাদন ক্ষমতা, হাত-পা পরিচালনার ক্ষমতা, ঘৃণা ও ক্রোধ, প্রীতি ও আকর্ষণ, ভীতি ও প্রলোভন রয়েছে কিন্তু এর কিছুই নিরর্থক নয়। তাদের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার জন্য এসব জিনিস দেয়া হয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে যেসব শক্তি দান করেছেন, মানুষ সঠিকভাবে তার সদ্ব্যবহার করলে তার উপর নির্ভর করবে তাদের দুনিয়ার জীবন ও তার সাফল্য।

আরো দেখতে পাওয়া যাবে যেসব শক্তি মানুষের মধ্যে দেয়া হয়েছে সেই সংগে তা কাজে লাগাবার মাধ্যমও দেয়া হয়েছে। সবার আগে রয়েছে মানুষের দেহ ; তার মধ্যে জরুরী যন্ত্রপাতি সবই মওজুদ রয়েছে। তারপর পারিপার্শ্বিক দুনিয়া যাতে প্রত্যেক ধরনের সংখ্যাতীত মাধ্যম আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। মানুষের সাহায্যের জন্য মওজুদ রয়েছে তার একই জাতীয় মানুষ। তার খেদমতের জন্য রয়েছে জানোয়ার, গাছপালা, খনিজদ্রব্য, যমীন, পানি, হাওয়া, তাপ, আলো, আরো এমন সংখ্যাতীত জিনিস। আল্লাহ এসব কিছু পয়দা করেছেন এ জন্য যে, মানুষ তাদেরকে কাজে লাগাবে এবং জীবন যাপন করার জন্য তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে।

এবার আর একটি দিক বিবেচনা করা যাক। যেসব শক্তি মানুষকে দেয়া হয়েছে, তা তাদের কল্যাণের জন্য দেয়া হয়েছে, ক্ষতির জন্য নয়। তা কাজে লাগাবার সঠিক পন্থা হবে তা-ই, যাতে কেবল কল্যাণই লাভ হবে, কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না, অথবা ক্ষতি হলেও তা যথাসম্ভব কম হবে। যুক্তি অনুসারে অন্যবিধ পন্থায় তা ব্যবহার করলে ভুল হবে। কেউ নিজে যদি এমন কোন কাজ করে যাতে তার নিজেরই ক্ষতি হয়, তা হলে তা অবশ্যি ভুল। যদি কেউ তার নিজস্ব শক্তিকে এমনভাবে কাজে লাগায়, যাতে অপরের ক্ষতি

হয়, তা হলে তা হবে ভুল। কোন শক্তি অপব্যবহার করে যদি কেউ আল্লাহর দেয়া উপায়-উপাদানের অপচয় করে, তবে তাতেও ভুল করা হবে। প্রত্যেকেরই যুক্তি ক্ষমতা এ সাক্ষ্যই দেবে যে, সকল প্রকার ক্ষতিকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তা স্বীকার করতে হবে তখনই, যখন তাকে এড়িয়ে চলা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না অথবা তার পরিণামে কোন বৃহত্তর কল্যাণের সম্ভাবনা থাকে।

এরপর আরো সামনে এগিয়ে চলা যাক। দুনিয়ায় দু'রকমের লোক দেখা যায়। এক ধরনের লোক ইচ্ছা করে তাদের কোন কোন শক্তিকে এমনভাবে কাজে লাগায়, যাতে সেই শক্তি তাদের নিজেদের অন্য কোন শক্তির ক্ষতিসাধন করে বা অন্যেরা তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা তাদেরকে দেয়া উপায়-উপাদানের অপব্যবহার করে ; অথচ সেইসব জিনিস তাদেরকে দেয়া হয়েছিল নিছক কল্যাণের জন্য অপচয়ের জন্য নয়। অপর শ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছা করে তেমন করে না, কিন্তু তাদের অজ্ঞতা বশত ভুল হয়ে যায়। প্রথমোক্ত দলের লোকেরা হচ্ছে দুষ্কৃতিকারী এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রয়োজন হয় আইন ও বিধানের। অপর যে শ্রেণীর লোক অজ্ঞতা হেতু ভুল করে, তাদের জন্য প্রয়োজন এমন শিক্ষাব্যবস্থা, যাতে তারা নিজস্ব শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার নির্ভুল পন্থা উপলব্ধি করতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা যে শরীয়াত তার পয়গাম্বরের মারফতে প্রেরণ করেছেন, তাতে এ প্রয়োজনই মিটানো হয়েছে। দুনিয়ার মানুষের কোন ক্ষমতাকে বিনষ্ট করার, কোন স্বাভাবিক আকাংখাকে দমিত করার অথবা মানুষের অনুভূতি ও আবেগকে নিশ্চিহ্ন করার কোন উদ্দেশ্যই তাতে নেই। শরীয়াত মানুষকে কখনো বলে না ঃ দুনিয়াকে বর্জন কর, উপবাস ও বিবস্ত্র হয়ে পাহাড়ে জংগলে জীবন অতিবাহন কর, আত্মার দাবী অস্বীকার করে নিজেকে কষ্ট সাধনায় নিক্ষেপ কর, জীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্য—সকল সুখকে নিজের জন্য হারাম করে দাও। শরীয়াত কখনো এ শিক্ষা দেয় না। এ হচ্ছে আল্লাহর তৈরী শরীয়াত এবং আল্লাহ-ই এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। কি করে তাঁর এ কারখানা ধ্বংস করে দিতে চাবেন ? মানুষের ভিতরে কোন শক্তিই তিনি নিরর্থক—অপ্রয়োজনে দান করেননি। কোন কাজে লাগানো যাবে না এমন জিনিস তিনি যমীন আসমানে কোথাও তৈরী করেননি। তিনি তো এ-ই চান যে, দুনিয়ার এ কারখানা পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকবে; মানুষ তার প্রত্যেকটি শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাবে ; দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিস থেকে পূর্ণ কল্যাণ লাভ করবে এবং যমীন-আসমানে যত রকম উপায়-উপকরণ নির্ধারিত হয়ে আছে, তার সবকিছুকে সে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে ; উপরোক্ত এ ধরনের অজ্ঞতা ও দুষ্কৃতি দ্বারা তারা নিজেদের ও অপরের ক্ষতি সাধন করবে না।

আল্লাহ্ শরীয়াতে সকল বিধানও তৈরী করে দিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে। যা কিছু মানুষের জন্য অকল্যাণকর শরীয়াতে সেগুলো হচ্ছে হারাম (নিষিদ্ধ) আর যা কিছু কল্যাণকর, তা হচ্ছে হালাল (বৈধ), যে কাজ করে মানুষ নিজের বা অপরের ক্ষতি সাধন করে শরীয়াতে তা নিষিদ্ধ। তার পক্ষে যা কিছু কল্যাণকর এবং যাতে অপরেরও কোন ক্ষতি নেই, এমনি সবকিছু করার অনুমতি দেয়া হয়েছে শরীয়াতে। তার সকল আইন এ নীতির উপর তৈরী হয়েছে, যাতে দুনিয়ার মানুষ তার সকল আকাংখা ও প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে এবং নিজস্ব কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার অধিকার লাভ করে ; উপরন্তু এ অধিকার থেকে তাকে এমনভাবে কল্যাণ লাভ করতে হবে যাতে অজ্ঞতা বা দুষ্কৃতি-হেতু সে অপরের অধিকার বিনষ্ট না করে। অধিকন্তু যতটা সম্ভব তাকে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে। যেসব কাজে এক দিকে কল্যাণ ও অপর দিকে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে শরীয়াতের নীতি হচ্ছে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্রতর ক্ষতিকে স্বীকার করে নেয়া এবং বৃহত্তর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ক্ষুদ্রতর কল্যাণকে বিসর্জন দেয়া।

যেহেতু কোন্ জিনিস বা কোন্ কাজ কতটা কল্যাণকর বা অকল্যাণকর সেই সম্পর্কে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেকটি মানুষ সমভাবে অবগত হতে পারে না, তাই সৃষ্টির সকল রহস্য জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের জন্য দিয়েছেন এক নির্ভুল বিধান। এখন থেকে বহু শতাব্দী আগে এ বিধানের বহুবিধ কল্যাণকর দিক মানুষের উপলব্ধির সীমানায় আসেনি ; কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার ক্রমোন্নতি সেই সব রহস্যকে অবগুণ্ঠনমুক্ত করেছে। তার বহুবিধ কল্যাণকর দিক মানুষ এখনও বুঝে উঠতে পারছে না ; কিন্তু যতই জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হতে থাকবে, ততই সেই রহস্য মানুষের কাছে প্রকাশ হতে থাকবে। যারা নিজস্ব দুর্বল ও অপরিণত জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে থাকে, তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভুল-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকার পর শেষ পর্যন্ত এ শরীয়াতের কোন না কোন বিধানকে মেনে নিতে বাধ্য হয় ; কিন্তু যারা আল্লাহর রাসূলের উপর নির্ভর করেছে, তারা জাহেলী ও অজ্ঞতার অনিষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছে, কেননা তার কল্যাণকর দিক সম্পর্কে তার জ্ঞান থাক অথবা না-ই থাক, সকল অবস্থায়ই তারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত আইনের আনুগত্য করেছে।

চতুর্বিদ অধিকার

ইসলামী শরীয়াতে মানুষের চার রকমের অধিকার নির্ধারিত রয়েছে।

এক ঃ আল্লাহর অধিকার ;

দুই ঃ মানুষের নিজস্ব দেহ ও মনের অধিকার ;

তিন ঃ আল্লাহর অন্যান্য বান্দার অধিকার, এবং

চার ঃ যেসব জিনিসকে কাজে লাগাবার ও তা থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য আল্লাহ্ মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত করে দিয়েছে, তাদের অধিকার।

এ চার রকমের অধিকার বুঝে নেয়া ও তাদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগান সত্যিকার মুসলমানের কর্তব্য। শরীয়াতে এসব অধিকার আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা আদায় করার এমন পদ্ধতি নির্ধারিত করা হয়েছে যাতে একই সাথে সকলের অধিকার আদায় করা যায় এবং যথাসাধ্য কারুর অধিকার বিনষ্ট না হয়।

আল্লাহর অধিকার

আল্লাহর প্রথম অধিকার হচ্ছে যে, মানুষ কেবলমাত্র তাকেই 'ইলাহ' বলে মানবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকেও শরীক করবে না। আগেই বলেছি যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার উপর ঈমান আনলেই এ অধিকার আদায় হয়ে যায়।

আল্লাহর দ্বিতীয় অধিকার হচ্ছে, যে হেদায়াত তার কাছ থেকে এসেছে, পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে নেয়া। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর' উপর ঈমান আনলেই এ অধিকার আদায় হয়ে যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি।

আল্লাহর তৃতীয় অধিকার হচ্ছে, তাঁর আদেশের আনুগত্য। আল্লাহর আইন—যা তাঁর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে বিধৃত হয়েছে, তা মেনে চলার ভিতর দিয়েই এ অধিকার আদায় করা যায়। এ সম্পর্কেও আমি আগেই ইশারা করেছি।

আল্লাহর চতুর্থ অধিকার তাঁর ইবাদাত করা। এ অধিকার আদায় করার জন্য মানুষের উপর যে যে কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে, তার বর্ণনা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ অধিকার অন্যবিধ সকল অধিকারের উপরে স্থান লাভ করে, তাই একে আদায় করতে গিয়ে কম-বেশী করে অন্যান্য অধিকারকে কুরবান করতে হয় ঃ যেমন, সালাত সওম প্রভৃতি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মানুষ নিজস্ব দেহ-মনের বহুবিধ অধিকারকে কুরবান করে থাকে। সালাতের জন্য মানুষ অতি প্রত্যুষে উঠে, ঠাণ্ডা পানিতে ওযু করে। দিনে রাতে কয়েকবার নিজের জরুরী কাজ ও অবসর বিনোদনের আনন্দ বর্জন করে। রমযানের সারা মাস ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়পরতা দমিত করার ক্লেশ স্বীকার করে ; যাকাত আদায় করতে গিয়ে আল্লাহ্ প্রেমের বশবর্তী হয়ে অর্থ-প্রেমকে কুরবান করে দেয়। হজ্জে তাকে স্বীকার করে নিতে হয় সফরের ক্লেশ ও

আর্থিক ত্যাগ। জিহাদে সে কুরবান করে নিজের ধন-প্রাণ। এমনি করে আল্লাহর অধিকার আদায় করতে গিয়ে কম-বেশী করে অপরের অধিকারও কুরবান করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সালাতের সময় ভৃত্যকে তার মনিবের কাজ ফেলে রেখে তার প্রকৃত মনিবের ইবাদাতের জন্য চলে যেতে হয়। হজ্জের সময় ব্যক্তি বিশেষকে সবরকম কাজ-কারবার বর্জন করে মক্কা মোয়াযযমার পথে সফর করতে হয় এবং তার সেই কর্তব্য পালনে আরো বহু লোকের অধিকার জড়িত থাকে। জিহাদে মানুষ একমাত্র আল্লাহরই জন্য প্রাণ হরণ করে ও প্রাণ দেয়। আল্লাহর অধিকার আদায়ের জন্য মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত বহু জিনিস ত্যাগ করতে হয়, যেমন পশু কুরবানী ও অর্থ ব্যয়।

আল্লাহ তা'য়ালা তার অধিকারের ক্ষেত্রে কতকগুলো সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তার ফলে যে অধিকার আদায় করার জন্য অপরের অধিকার থেকে যতটা কুরবানী জরুরী তার বেশী করার প্রয়োজন হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সালাতের প্রশ্নই ধরে নেয়া যাক। আল্লাহ তা'য়ালা যেসব সালাত ফরয করে দিয়েছেন, তা আদায় করার সবরকম সুবিধা করে দেয়া হয়েছে। ওযুর পানি যদি না পাওয়া যায় অথবা কেউ যদি পীড়িত থাকে তা হলে তায়াম্মুম করে নিতে পারে। সফরে থাকলে সালাত সংক্ষিপ্ত করে নিতে হয়। অসুস্থ থাকলে বসে অথবা বিছানায় শুয়ে সালাত আদায় করতে পারে। আবার সালাতে যা কিছু পড়তে হয়, তাও এমন বেশী নয় যে, এক ওয়াক্তের সালাতে কয়েক মিনিটের বেশী সময় ব্যয় হতে পারে। প্রশান্তির সময়ে মানুষ ইচ্ছা করলে সালাতে সূরা বাকারার মত পূর্ণ একটি সূরা পড়তে পারে ; কিন্তু কর্মব্যস্ততার সময়ে লম্বা সালাত আদায় নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আবার ফরয সালাত ব্যতীত নফল সালাত যদি কোন ব্যক্তি আদায় করতে চায়, তাতে আল্লাহ তার উপর খুশী হন, কিন্তু তিনি চান না যে, কেউ নিজের জন্য রাতের ঘুম ও দিনের আরাম হারাম করে দেয়, অথবা নিজের রুযী-রোযগারের সময় কেবল সালাত আদায় করে কাটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহর বান্দাদের অধিকার বিনষ্ট করে সালাত আদায় করতে থাকে।

এমনি করে সওমের ক্ষেত্রেও সবরকম সুবিধা দেয়া হয়েছে। সারা বছরে কেবল এক মাসের জন্য সওম ফরয করে দেয়া হয়েছে। তাও সফরের সময়ে অথবা অসুস্থ অবস্থায় কাযা করা যেতে পারে। সওম আদায়কারী যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং প্রাণের ভয় থাকে তাহলে ভেঙ্গে দেয়া যায়। সওমের জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে, তার চেয়ে এক মিনিট বেশী সওম রাখা সংগত নয়। সেহ্‌রীর শেষ সময় পর্যন্ত খানাপিনার অনুমতি রয়েছে। এবং ইফতারের সময় আসা মাত্র অবিলম্বে সওম খুলবার হুকুম দেয়া হয়েছে। ফরয সওম ছাড়া যদি

কেউ নফল সওম রাখে, তাতে আল্লাহ্ অত্যন্ত খুশী হবেন। কিন্তু আল্লাহ চান না যে, কেউ ক্রমাগত সওম রাখতে থাকবে আর নিজেকে কোন রকম কাজ করতে না পারার মত কমজোর করে ফেলবে।

যাকাতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নতম হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এবং তাও কেবল এমন লোকের জন্য ফরয করে দিয়েছেন, যারা নির্ধারিত নিসাবের সম্পত্তির অধিকারী। যদি কেউ আল্লাহ্‌র রাহে তার চেয়ে বেশী সদকা ও খয়রাত করতে থাকে, তাতে আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিধান করা হয় ; কিন্তু আল্লাহ্ চান না যে, কেউ নিজের ও স্বজনদের অধিকার কুরবান করে সবকিছু সদকা ও খয়রাতে ব্যয় করে দেবে এবং নিজে নিজে নিস্ব হয়ে বসে থাকবে। দানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তারপর আসে হজ্জের প্রশ্ন। প্রথমেই তো হজ্জ কেবল তাদের জন্য ফরয হয়েছে, যারা সফরের ব্যয় নির্বাহের ও দৈহিক ক্লেশ স্বীকারের যোগ্য। আবার এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা এই দেয়া হয়েছে যে, সারা জীবনে মাত্র একবার সুবিধা মত হজ্জ করতে হবে। যদি পথের মধ্যে কোথাও লড়াই চলতে থাকে, অথবা জীবন বিপন্ন হবার মতো আশংকা থাকে, তা হলে হজ্জের সংকল্প মুলতবী রাখা যেতে পারে। এর সাথে সাথে আবার হজ্জের জন্য বাপ-মার অনুমতি অপরিহার্য বলে ধরা হয়েছে, যেন পুত্রের অনুপস্থিতিতে বুড়ো বাপ-মা'র কোন কষ্ট না হয়। এসব বিধান থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজস্ব অধিকারের ক্ষেত্রে অপরের অধিকার কত বিবেচনা করেছেন।

আল্লাহর অধিকার আদায়ের জন্য মানুষের অধিকার সবচেয়ে বেশী কুরবানী করতে হয় জিহাদের সময়, কেননা তখন মানুষকে নিজের ধন-প্রাণ আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে দিতে হয় এবং অপরের ধন-প্রাণও কুরবান করতে হয়। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের নীতি হচ্ছে, বৃহত্তর ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ক্ষুদ্রতর ক্ষতি স্বীকার করে নেয়া। এ নীতিকে দৃষ্টির সামনে রেখে বিচার করলে বুঝতে পারা যায় যে, কয়েক শ,' কয়েক হাযার অথবা কয়েক লাখ জীবন বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে সত্যের উপর মিথ্যার বিজয়, কুফর, শির্‌ক ও নাস্তিকতার সামনে আল্লাহর দ্বীনের পরাজয় ; দুনিয়ার বুকে গুমরাহী ও নীতিহীনতার প্রসার। এ জন্যই এ বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে হুকুম দিয়েছেন তারা যেন জান-মালের ক্ষুদ্রতর ক্ষতিকে তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীকার করে নেয় কিন্তু তার সাথেই একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যতোটা রক্তপাত অপরিহার্য ; তার বেশী যেন না করা হয়। বৃদ্ধ, শিশু, নারী, আহত ও রুগ্ন মানুষের উপর হাত তোলা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। লড়াই করতে হবে

কেবল তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা মিথ্যার সহায়তার জন্য তরবারি উত্তোলিত করেছে। দুশমনের দেশে বিনা কারণে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং বিজয় লাভের পর দুশমনের উপর ন্যায়সংগত আচরণ করার বিধান রয়েছে। কোন বিষয় নিয়ে দুশমনের সাথে চুক্তি সম্পাদন করলে তা মেনে চলতে হবে। সত্যের বিরুদ্ধে দুশমনি থেকে তারা যখন বিরত হবে, তখন লড়াই বন্ধ করতে হবে। এসব বিধান থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর অধিকার আদায়ের জন্য মানবীয় অধিকার যতোটা কুরবানী করা অপরিহার্য, তার বেশী কুরবানী করা বৈধ বলে গণ্য করা হয়নি।

নিজস্ব অধিকার

এবার দ্বিতীয় প্রকারের অধিকার অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব দেহ ও মনের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সম্ভবত একথায় অনেকেই বিস্মিত হবে যে, মানুষ আর সবাইকে ছেড়ে তার নিজের উপরই যুলুম করে থাকে। কথাটা সত্যি বিস্ময়করই বটে। কেননা প্রকাশ্যভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করে যে, সে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে তার নিজের সত্তাকে এবং সম্ভবত একথা কেউ স্বীকার করবে না যে, সে তার নিজের বিরুদ্ধেই দুশমনি করে ; কিন্তু একটুখানি বিবেচনা করে দেখলে বিষয়টির সত্যতা সকলেই উপলব্ধি করতে পারবে।

মানুষের মধ্যে একটি বড় রকমের দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, কোনরূপ ইন্দ্রিয়লালসা যখন তার উপর বিজয়ী হয়, তখন সে তার গোলাম বনে যায় এবং ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করার জন্য জেনে অথবা না জেনে নিজেরই অনেক কিছু ক্ষতি করে বসে। দেখা যায়, কোন কোন লোককে শরাবের নেশায় পেয়ে বসে, সে তার পেছনে দেওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি, অর্থের ক্ষতি, সম্মানহানী—এক কথায় সবকিছুর ক্ষতি সে স্বীকার করে নেয়। অপর এক ব্যক্তি আবার পেটুক, সে সবরকমের খাবার নির্ভাবনায় খেতে থাকে এবং এমনি করে নিজের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। তৃতীয় আর এক ব্যক্তি হয়তো যৌন-লালসার দাস হয়ে যায় এবং ক্রমাগত এমনভাবে তার আকাংখা চরিতার্থ করতে থাকে যে, তার অবশ্যম্ভাবী ফল হয় নিজের ধ্বংস। চতুর্থ আর এক ব্যক্তি চায় আত্মিক উন্নতি, জীবনের সকল চাহিদাকে সে উপেক্ষা করে, অন্তরের সকল আকাংখ্যাকে সে দমিত করে রাখে, দেহের চাহিদা মিটাতে সে অস্বীকার করে, বিবাহ করে না, পানাহার থেকে সংযত হয়ে থাকে, পোশাক ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করে না, এমন কি শ্বাস নিতেও সে রাযী নয়, বনে-জংগলে আর পাহাড়ে গিয়ে সে কাটিয়ে দেয় জীবন ; ভাবে, এ দুনিয়া তার জন্য তৈরী হয়নি। আমি নেহায়েত দৃষ্টান্তের খাতিরে মানুষের মধ্যে

চরমপন্থীদের কয়েকটি নমুনা পেশ করেছি। এমনি চরমপন্থী মনোভাবের সংখ্যাতীত রূপ আমরা রাত দিন আমাদের চারপাশে দেখতে পাচ্ছি।

ইসলামী শরীয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। তাই মানুষকে সে হুঁশিয়ার করে দেয় ঃ فلنفسك عليك حق —"তোমার উপর তোমার নিজেরই হক রয়েছে।"

যা কিছু মানুষের অনিষ্ট সাধন করে, ইসলামী শরীয়াত তা থেকে মানুষকে বিরত করে, যেমন—শরাব, তাড়ি, আফিম প্রভৃতি সব মাদক দ্রব্য। শরীয়াত শুকরের মাংস, হিংস্র ও বিষাক্ত জানোয়ারের মাংস, নাপাক জীব-জানোয়ার, মৃত জানোয়ার প্রভৃতি মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করেছে, কেননা এসব জিনিস মানুষের স্বাস্থ্য, চরিত্র, বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মিক শক্তির উপর অত্যধিক অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করে। এর পরিবর্তে শরীয়াত মানুষের জন্য পবিত্র ও কল্যাণকর জিনিসসমূহ হালাল করে দিয়েছে এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছে যে, সে যেন এসব পবিত্র খাদ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে না রাখে, কেননা তার উপর তার দেহের অধিকার রয়েছে।

শরীয়াত তাকে উলংগ থাকায় বিরত করে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার দেহের শোভা বর্ধনের জন্য যে পোশাক নির্দেশ করেছেন, সে যেন তার ব্যবহার করে এবং দেহের যে অংশ খোলা রাখা নির্লজ্জতার শামিল তা যেন সে ঢেকে রাখে।

শরীয়াত তাকে রুযী-রোযগারের হুকুম দিয়েছে এবং তাকে উপদেশ দিয়েছে যে, সে যেন বেকার বসে না থাকে, ভিক্ষা প্রার্থী না হয়, ক্ষুধায় না মরে, আল্লাহ যেসব শক্তি তাকে দান করেছেন সেগুলো যেন কাজে লাগায় এবং তার প্রতিপালন ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যমীন ও আসমানে যত মাধ্যম সৃষ্টি করে দিয়েছেন, বৈধ উপায়ে তা হাসিল করে।

শরীয়াত মানুষকে তার ইন্দ্রিয়লালসা দমিত করতে বিরত করে হুকুম দিয়েছে যে, সে যেন নিজের লালসা চরিতার্থ করার জন্য বিবাহ করে।

শরীয়াত মানুষকে তার আত্মার দাবী অস্বীকার করতে নিষেধ করেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে যে, সে যেন আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনের আস্বাদ নিজের জন্য হারাম করে না দেয়। যদি সে আত্মিক উন্নতি, আল্লাহর সান্নিধ্য ও আখেরাতের নাজাত কামনা করে, তা হলে সেই জন্য দুনিয়াকে বর্জন করতে হবে না, বরং দুনিয়ায় পরিপূর্ণ ও পাকা দুনিয়াদার হয়ে সে আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাঁর অবাধ্যতা থেকে ভীতিসহকারে দূরে থাকবে এবং তাঁর নির্ধারিত আইনসমূহের

আনুগত্য করবে। এ হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের উপায়।

আত্মার চাহিদা অস্বীকার করা শরীয়াতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। তাতে মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তার ধন-প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর সম্পত্তি। এ আমানত তাকে দেয়া হয়েছে এ জন্যে যে, সে আল্লাহর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তা কাজে লাগাবে—তার অপব্যবহার করার জন্য নয়।

বান্দাদের অধিকার

শরীয়াত এক দিকে মানুষের দেহ ও আত্মার অধিকার আদায় করার হুকুম দিয়েছে, অপরদিকে তাতে এক নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এসব অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সে এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে না, যাতে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়, কেননা এমনি করে স্বকীয় আকাংখা ও প্রয়োজনের চাহিদা মিটাতে গেলে মানুষের নিজের আত্মাও দুষিত হয় এবং অপরের সর্বপ্রকার ক্ষতি সাধিত হয়। উপরন্তু শরীয়াত চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, প্রতারণা, সুদখোরী, জালিয়াতি প্রভৃতি দুষ্কৃতি হারাম করে দেয়া হয়েছে, কেননা এসব পন্থায় ব্যক্তি বিশেষের কিছুটা লাভ হলেও তা প্রকৃতপক্ষে অপরের ক্ষতি করেই হাসিল করে থাকে। মিথ্যা, পরনিন্দা, চোগলখোরী, মিথ্যা দোষারোপও হারাম করা হয়েছে ; কেননা এসব কাজ অপরের পক্ষে ক্ষতিকর। জুয়া, লটারী প্রভৃতি হারাম করা হয়েছে, কারণ তাতে হাযার হাযার মানুষের ক্ষতির বিনিময়ে ব্যক্তি বিশেষের লাভ হয়। ধোঁকাবাজি, প্রতারণামূলক আদান-প্রদান ও এ ধরনের ব্যবসাকেও হারাম করা হয়েছে, কারণ তাতে কোন বিশেষ পক্ষের ক্ষতির নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। হত্যা ও কলহ-বিবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ; কারণ ব্যক্তি বিশেষের নিজের লাভ বা আকাংখা অর্জনের জন্য অপরের প্রাণ হরণ অথবা অপরকে ক্লেশদানের অধিকার কারুর নেই ; যেনা-ব্যাভিচার ও অস্বাভাবিক যৌন সংযোগ হারাম করা হয়েছে, কারণ এসব কাজে একদিকে ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও চরিত্রের হানি হয়, অপরদিকে তাতে সমগ্র সমাজ-দেহে নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতা প্রসার লাভ করে, কুৎসিত ব্যাধির উদ্ভব হয়, দেহ সৌষ্ঠবের বিকৃতি ঘটে, কলহ-বিবাদের উদ্ভব হয় এবং মানবীয় সম্পর্কের বিকৃতি ঘটে। সর্বোপরি তার ফলে জাতির তাহযীব তামাদ্দুনের সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মানুষ যাতে তার নিজ ও মনের অধিকার আদায় করতে গিয়ে অপরের অধিকার বিনষ্ট না করে তারই জন্য ইসলামী শরীয়াতে উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছে ; কিন্তু মানবীয় তামাদ্দুনের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য এমন ব্যবস্থায়ই যথেষ্ট নয়, যাতে ব্যক্তি-বিশেষ অপরের ক্ষতি না করতে

পারে, বরং তার জন্য যরুরী হচ্ছে লোকদের মধ্যে এমন একটা পারস্পরিক সম্পর্ক কায়েম করা যাতে একে অপরের কল্যাণকর কাজে সহায়ক হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে শরীয়াত যেসব আইন তৈরী করে দিয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এখানে তুলে ধরছি।

মানবীয় সম্পর্কের শুরু হয় পরিবার থেকে। তাই সবার আগে সেই দিকে নযর দেয়া যাক। পরিবার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সমন্বয়ে গঠিত। ইসলামী আচরণ পদ্ধতি অনুসারে জীবিকা অর্জন, পারিবারিক চাহিদা মিটানো এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের হেফাযত করার দায়িত্ব থাকে পুরুষদের উপর এবং স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে এই যে, পুরুষ যা রোযগার করে আনে, তা দিয়ে সে ঘরের সবরকম ব্যবস্থা করবে, স্বামী ও সন্তান-সন্ততির সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করবে এবং সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দান করবে। সন্তান-সন্ততির কর্তব্য হচ্ছে, তার মা-বাপের আনুগত্য করবে ; ওদের সাথে আদব সহকারে আচরণ করবে এবং তাদের বার্ধক্যে তাঁদের খেদমত করবে। পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য ইসলাম বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এক হচ্ছে এই যে, স্বামী অথবা পিতাকে ঘরের পরিচালক ও প্রধান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ; কেননা যেমন করে একজন পরিচালক ছাড়া একটি শহরের ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে চলে না। প্রধান শিক্ষক ছাড়া বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা চলে না তেমনি এক নির্দিষ্ট পরিচালক না থাকলে পারিবারিক ব্যবস্থাপনাও সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। যে পরিবারে প্রত্যেকটি লোক আপন ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়, সেখানে বিশৃংখলা ও অব্যবস্থার রাজত্ব চলবেই। সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বা খুশীর অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। স্বামী একদিকে গেলে স্ত্রী যাবেন অপরদিকে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি যাবে অধঃপাতে। এসব অব্যবস্থা দূর করার জন্য প্রত্যেক পরিবারে একজন পরিচালক থাকা অপরিহার্য এবং এ কাজটি পুরুষের উপরই ন্যস্ত হতে পারে—কেননা ঘরের অন্যান্য বাসিন্দার প্রতিপালন ও হেফাযতের যিম্মাদার এ পুরুষ। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হচ্ছে এই যে, বাইরের সব কাজের বোঝা পুরুষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নারীকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, বিনা প্রয়োজনে সে যেন ঘরের বাইরে না যায়। তাকে বাইরের কার্য থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে সে প্রশান্তি সহকারে ভিতরের কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, মেয়েদের বাইরে কদম ফেলাই নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হলে তাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে ; কিন্তু শরীয়াতের লক্ষ্য এই যে, তাদের কর্তব্যের আসল ক্ষেত্র হবে তাদের গৃহ এবং তাদের সম্পূর্ণ শক্তি গার্হস্থ্য জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তোলার কাজেই ব্যয়িত হবে।

রক্তের সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিতর দিয়েই পরিবারের প্রসার হয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে যেসব লোক পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, তাদের ভেতরে সুষ্ঠু

সম্পর্ক বজায় রাখার এবং তাদেরকে পরস্পরের সাহায্যকারী করে তোলার উদ্দেশ্যে শরীয়াতের বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি ব্যবস্থার বর্ণনা দেয়া যাচ্ছে ঃ

এক ঃ যেসব পুরুষ ও নারীকে স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত নিকট সংযোগে মিলে-মিশে থাকতে হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হারাম করে দেয়া হয়েছে, যেমন মাতা-পুত্র, বাপ-মেয়ে, বিপিতা (Step-Father) ও স্ত্রীর গর্ভে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা (Step-Daughter), বিমাতা ও স্বপত্নী-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী, চাচা ও ভাতুষ্পুত্রী, ফুফু ও ভাতৃষ্পুত্র, মামা ও ভাগ্নেয়ী, খালা ও ভগ্নীপুত্র, শ্বাশুড়ী ও জামাতা, শ্বশুর ও পুত্রবধু। এসব বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করার অসংখ্য কল্যাণের মধ্যে হচ্ছে এই যে, এসব নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র থাকে এবং অকৃত্রিম স্নেহে বিনা বাঁধায় তারা পরস্পর মেলা-মেশা করতে পারে।

দুই ঃ উপরিউক্ত নিষিদ্ধ সম্পর্কের বাইরে সম্পর্কযুক্ত অপর নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ করে দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো বলিষ্ঠ হতে পারে। যে লোকেরা পরস্পরের স্বভাব ও চাল-চলনের সাথে পরিচিত থাকে, তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অধিকতর সাফল্যযুক্ত হয়। অপরিচিত পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের ফলে অনেক ক্ষেত্রে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এ কারণে ইসলামে অপরিচিত পরিবার অপেক্ষা সম্পর্কিত পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

তিন ঃ সম্পর্কযুক্ত পরিবারসমূহের মধ্যে গরীব ও ধনী, সচ্ছল ও অসচ্ছল —সবরকম লোকই থাকে। ইসলামের বিধান হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সবচেয়ে বেশী হক রয়েছে তার আত্মীয়-স্বজনের। শরীয়াতের পরিভাষায় এর নাম হচ্ছে 'ছিলায়ে রেহমী' এবং এর জন্যে শরীয়াতের বিশেষ তাকীদ রয়েছে। স্বজনদের সাথে বে-ওফায়ী (অকৃতজ্ঞ ব্যবহার) করাকে বলা হয় 'কাতয়ে রেহমী' এবং ইসলামে এটি হচ্ছে কঠিন গুনাহের কাজ। কোন নিকট আত্মীয় গরীব হয়ে পড়লে অথবা কোন বিপদে পড়লে সচ্ছল আত্মীয়ের ফরয হচ্ছে তাকে সাহায্য করা। সদকা ও খয়রাতের বেলাও বিশেষ করে স্বজনদের হক স্বীকৃত হয়েছে।

চার ঃ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনও এমনভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে, যার ফলে কোন ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি রেখে মারা গেলে—সে সম্পত্তি কম হোক আর বেশী হোক—তাকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে দেয়া হয় না বরং তা থেকে তার স্বজনরা কম-বেশী করে অংশ লাভ করে। পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, মা, বাপ,

ভাই, বোন মানুষের সবচেয়ে বেশী নিকট আত্মীয়। তাই উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সবার আগে তাদেরই অংশ নির্ধারিত হয়েছে। তারা না থাকলে তাদের পর যে আত্মীয় নিকটতর, সে অংশ পাবে এবং এমনি করে এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বহু আত্মীয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ইসলামের এ আইন দুনিয়ায় অতুলনীয় এবং বর্তমানে অপর জাতিসমূহও তার অনুসরণ করছে ; কিন্তু আফসোস, মুসলমান নিজস্ব অজ্ঞতা ও নাদানির জন্য অনেক ক্ষেত্রে এ আইনের বিরুদ্ধাচারণ করছে। বিশেষ করে মেয়েদের প্রাপ্য অংশে তাদেরকে বঞ্চিত করার রীতি বাংলাদেশে ও হিন্দুস্তানে খুব বেশী প্রসার লাভ করছে, অথচ এ হচ্ছে একটি বড় রকমের যুলুম এবং কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী।

পরিবারের পর মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠে তার বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, একই শহর বা গ্রামের বাসিন্দা ও মহল্লাবাসীদের সাথে, যাদের সাথে মিলে তার কোন না কোন রকম কাজ-কারবার করতে হয়। ইসলামের বিধান অনুসারে তাদের সবার সাথে সত্য, ন্যায় ও সততার সাথে আচরণ করতে হবে, কাউকে কষ্ট দেয়া চলবে না, কারুর অন্তরের আঘাত দেয়া যাবে না। অশ্লীলতা ও কুবাক্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে। একে অপরের সাহায্য করতে হবে। রুগ্নের শুশ্রূষা করতে হবে, কেউ মরে গেলে তার জানাযায় শরীক হতে হবে, কারুর বিপদ ঘটলে তাকে দেখাতে হবে সমবেদনা। গরীব প্রার্থী ও অক্ষম লোককে গোপনে সাহায্য করতে হবে। ইয়াতীম ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করতে হবে। ক্ষুধিতের মুখে তুলে দিতে হবে আহার, বস্ত্রহীনকে দিতে হবে বস্ত্র, বেকার লোককে কর্মসংস্থান করতে সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ধন-দৌলত দিয়ে থাকলে তা নিজের আয়েশ-আরামের জন্য উড়িয়ে দেয়া যাবে না। সোনা-রূপার পাত্র ও অলংকার ব্যবহার, রেশমী পোশাক পরিধান এবং নিজস্ব অবসর বিনোদন ও নিরর্থক আয়েশ-আরামের জন্য অর্থের অপচয় নিষিদ্ধ করার মূলে রয়েছে, ইসলামের এ নীতি যে, আল্লাহর হাযার হাযার বান্দাহর রিয্কের ব্যবস্থা হতে পারে যে অর্থ দিয়ে তা যেন কেউ নিছক নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় না করে। যে অর্থ দিয়ে, বহু লোকের উদরের সংস্থান হতে পারতো, তা ব্যক্তি-বিশেষের দেহে অলংকার হয়ে ঝুলবে অথবা তার টেবিলের উপর মূল্যবান পাত্র হিসাবে শোভা পাবে, অথবা মূল্যবান গালিচা হিসাবে তার ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে, অথবা আগুনে পুড়ে যাবে, এ হচ্ছে এক ধরনের যুলুম। ইসলাম কারুর ধন-দৌলত ছিনিয়ে নিতে চায় না। যা কিছু কেউ অর্জন করে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে ; তার অধিকারী সে নিজেই থাকবে। ইসলাম প্রত্যেককে পূর্ণ অধিকার দিচ্ছে যে, সে তার নিজস্ব দৌলত ভোগ করে

যেতে পারে। আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন, তার প্রভাব তার পোশাকে, বাড়ী-ঘরে ও বাহনে পড়বে, ইসলামে তাও জায়েয করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকে সহজ-সরল ও হিসেবী জীবন যাপন করবে। কেবল তার প্রয়োজনের চাহিদা সীমাহীন করে তুলবে না এবং নিজের সাথে সাথে বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন, প্রতিবেশী, দেশবাসী, জাতির অন্যান্য লোক ও জনসাধারনের অধিকারের প্রতিও খেয়াল রাখবে।

এ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে এবার বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে নযর দেয়া যাক। এ বৃহত্তর ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে তামাম দুনিয়ার মুসলমানকে নিয়ে এ ক্ষেত্রে ইসলাম এমনি সব আইন ও বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে মুসলমান একে অপরের কল্যাণের সহায়ক হতে পারে এবং তাদের মধ্যে অন্যায় সৃষ্টির যাবতীয় পথ যথাসম্ভব রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এ গুলোর মধ্য থেকে কয়েকটির প্রতি আমি এখানে ইংগিত করব।

এক ঃ জাতীয় চরিত্র সংরক্ষণের জন্য বিধান দেয়া হয়েছে যে, যেসব নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ নয়, তারা যেন স্বাধীনভাবে পরস্পর মেলামেশা না করে। মহিলাদের সামাজিক পরিবেশ থাকবে আলাদা এবং পুরুষের থাকবে আলাদা। নারী জাতি গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করবে সবচেয়ে বেশী। তাদের বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে সাজসজ্জা করে বাইরে যাবে না, সাদা পোশাক পরিধান করে সর্বাংগ ভাল করে ঢেকে বেরুবে। মুখ ও হাত অনাবৃত করা অপরিহার্য প্রয়োজন না হলে তা ঢেকে রাখতে হবে এবং যদি সত্যি সত্যি কোন অপরিহার্য প্রয়োজনের উদ্ভব হয় তা হলে কেবলমাত্র সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য হাত-মুখ অনাবৃত করবে। এর সাথে সাথে পুরুষদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, অপর নারীর দিক থেকে দৃষ্টি সংযত করবে। হঠাৎ কোন নারী নযরে পড়লে নযর ফিরিয়ে নেবে। দ্বিতীয়বার তাকে দেখবার চেষ্টা করা অন্যায় এবং তার সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা অধিকতর অন্যায়। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর কর্তব্য হচ্ছে ঃ সে নিজস্ব চরিত্র সংরক্ষণ করবে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা ইন্দ্রিয়লালসা মিটাবার জন্য যে বিবাহের বিধান দিয়েছেন, তার সীমানার বাইরে পদক্ষেপ করবে না অথবা তেমন কোন আকাংখা অন্তরে পোষণ করবে না।

দুই ঃ জাতীয় চরিত্র সংরক্ষণের জন্যই বিধান দেয়া হয়েছে যে, কোন পুরুষ হাটু থেকে নাভীস্থলের মধ্যবর্তী অংশ এবং কোন নারী স্বামী ছাড়া অপর কোন ব্যক্তির সামনে মুখ ও হাত ব্যতীত দেহের অপর কোন অংশ যেন অনাবৃত না করে, সে ব্যক্তি তার যতই নিকট সম্পর্কযুক্ত হোক। শরীয়াতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সত্‌র' এবং দেহের এ অংশকে আবৃত রাখা পুরুষ ও

নারী সকলের জন্য ফরয। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে লজ্জার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং নির্লজ্জতার প্রসার বন্ধ করা যার পরিণামে চরিত্রহীনতা সৃষ্টি হতে পারে।

তিন ঃ ইসলাম এমন সব অবসর বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ পসন্দ করে না, যার ফলে চরিত্রের অবনতি ঘটে ; অসদাকাংখা জন্মলাভ করে এবং সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থের অপচয় ঘটে। অবসর বিনোদন মানুষের মধ্যে জীবনীশক্তি উজ্জীবিত করার ও কর্মপ্রেরণা সঞ্চারের জন্য নিসন্দেহে অপরিহার্য ; কিন্তু সেই অবসর বিনোদন হবে এমন, যা আত্মাকে সজীব করে তোলে; যা অন্তরকে আরো দুষিত ও অধঃপতিত করে না। হাযার হাযার মানুষ একত্র হয়ে কাল্পনিক দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্কর্ম ও নিলর্জ্জ আচরণের আলোচনায় বেহুদা সময়ের অপচয় করা আপাতত আনন্দদায়ক হলেও তাতে জাতীয় চরিত্র ও স্বভাবের বিকৃতি ঘটে।

চার ঃ জাতীয় ঐক্য ও কল্যাণের জন্য মুসলমানদেরকে তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের মধ্যে বিরোধ থেকে আত্মরক্ষা করে, বিভিন্ন দল সৃষ্টি থেকে বিরত তাকে এবং কোন ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে, সাধু সংকল্প সহকারে কুরআন ও হাদীস থেকে তার মীমাংসা করার চেষ্টা করে। তাতেও মীমাংসা না হলে নিজেদের মধ্যে লড়াই না করে যেন আল্লাহর উপর তার মীমাংসা ন্যস্ত করে দেয়। জাতীয় কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে, কওমের প্রধান ব্যক্তিদের আনুগত্য করবে, বিরোধ সৃষ্টিকারীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজস্ব উদ্যমের অপচয় করবে না, জাতীয় কলংক সৃষ্টি করবে না।

পাঁচ ঃ অমুসলিম কওমের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করার ও তার বাস্তব প্রয়োগ শিক্ষা করার পূর্ণ অনুমতি মুসলমানদের রয়েছে ঃ কিন্তু জীবন ক্ষেত্রে তাদেরকে অনুকরণ করা নিষিদ্ধ হয়েছে। কোন জাতি কেবল তখনই অপর জাতিকে অনুকরণ করে, যখন সে তার নিজের হীনতা ও দুর্বলতা উপলব্ধি করে। এ হচ্ছে দাসত্বের সর্বনিম্ন স্তর। এ হচ্ছে নিজস্ব অধোগতি ও পরাজয়ের প্রকাশ্য ঘোষণা এবং এর শেষ পরিণতি হিসেবে অনুকরণকারী কওমের তাহযীব ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) অপর জাতির জীবন পদ্ধতির অনুকরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সাধারণ বুদ্ধির লোকও এ কথা বুঝতে পারে যে, কোন কওমের শক্তি তার পোশাক অথবা তার জীবন ধারণ পদ্ধতি থেকে হয় না, তা উদ্ভব হয় তার জ্ঞান, তার শৃংখলা ও তার কর্মোদ্যম থেকে। যদি শক্তি অর্জন করতে হয়, তাহলে অন্যান্য

জাতি যা থেকে শক্তি অর্জন করেছে তা গ্রহণ করতে হবে। এমন সব জিনিস গ্রহণ করা যাবে না, যার ফলে জাতিসমূহ গোলামী বরণ করে এবং পরিণামে অপর জাতির মধ্যে সমাহিত হয়ে তার নিজস্ব জাতীয় অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

অমুসলমানের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানকে অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির শিক্ষা দেয়া হয়নি। তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নিন্দা ও তাদের ধর্মের অবমাননা করা নিষিদ্ধ হয়েছে। তাদের সাথে নিরর্থক কলহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তারা যদি আমাদের সাথে শান্তিপূর্ণ ও আপোষসূচক সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এবং আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে তা হলে আমাদেরকেও সে ক্ষেত্রে তাদের সাথে শান্তি বজায় রাখার, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ও বিচার সংগত আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামী শরাফত আমাদের কাছে এ দাবীই করে যে, আমরা এগিয়ে গিয়ে সবার সাথে মানবীয় সহানুভূতি প্রদর্শন ও সদাচরণ করব। অসদাচরণ, যুলুম ও সংকীর্ণ মানসিকতা মুসলমানের মর্যাদার পরিপন্থী। দুনিয়ায় মুসলমানকে এ জন্যই পয়দা করা হয়েছে যে, সে হবে সুষ্ঠু সুন্দর চরিত্র, শরাফত ও সততার সর্বোত্তম আদর্শ এবং নিজস্ব নীতি দ্বারা সে অপর জাতির অন্তর জয় করবে।

আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার

এখন সংক্ষেপে চতুর্থ অধিকারের কথা বলবো। আল্লাহ তাঁর বেশুমার সৃষ্টির উপর মানুষকে দান করেছেন ইখতিয়ার। মানুষ নিজস্ব শক্তি দিয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ব করেছে, তাদেরকে কাজে লাগাচ্ছে, তা থেকে কল্যাণ লাভ করছে। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি হিসেবে তাকে অধিকার দেয়া হয়েছে পূর্ণরূপে। আবার তাদেরও অধিকার রয়েছে মানুষের উপর এবং তাদের সেই অধিকার হচ্ছে এই যে, মানুষ যেন তাদের নিরর্থক অপব্যবহার না করে, অথবা বিনা প্রয়োজনে তাদের ক্ষতি না করে অথবা আঘাত না দেয়। নিজের কল্যাণের জন্য ঠিক যতটা প্রয়োজন, ততটা ক্ষতিই যেন সে করে এবং তাদের ব্যবহার করে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।

শরীয়াতে এ সম্পর্কে বহুবিধ বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জানোয়ারসমূহকে তাদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য অথবা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্য হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে ; কিন্তু বিনা প্রয়োজনে খেলা বা অবসর বিনোদনের জন্য তাদের প্রাণনাশ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খাদ্যের উদ্দেশ্যে জানোয়ারের প্রাণ নাশ করার জন্য যবেহ করার পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। জানোয়ার থেকে উত্তম গোশত পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে এই। এ ছাড়া অন্যবিধ পদ্ধতি কম কষ্টদায়ক হলেও তাতে গোশতের কল্যাণকর উপাদানের অপচয় হয়। এ ছাড়া অন্য যে যে পদ্ধতিতে গোশতের

কল্যাণকর উপাদান সংরক্ষিত হতে পারে তা যবেহ পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর কষ্টদায়ক। ইসলাম এর উভয় পদ্ধতিই এড়িয়ে চলতে চায়। ইসলামে জানোয়ারকে কষ্ট দিয়ে নির্দয়তা সহকারে হত্যা করা অত্যন্ত দোষাবহ (মাকরূহ)। বিষাক্ত ও হিংস্র জানোয়ারকে এ জন্য হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, মানুষের জীবন তাদের জীবন অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান, কিন্তু তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা জায়েয রাখা হয়নি।

যেসব জীব-জানোয়ারকে বাহন ও ভারবাহী হিসেবে কাজে লাগানো হয়, তাদেরকে ক্ষুধিত রাখা, তাদের কাছ থেকে অত্যধিক কাজ আদায় করা এবং তাদেরকে নির্দয়ভাবে মারপিট নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাখীদেরকে ধরে খাঁচায় বদ্ধ করে রাখাও মাকরূহ বলে গণ্য করা হয়েছে। জানোয়ার তো দূরের কথা, এমন কি বিনা প্রয়োজনে গাছ-গাছড়া কাটাও ইসলামে সমর্থিত হয় না। সকলেই তার ফল-ফুল ভোগ করতে পারে ; কিন্তু তাদেরকে বরবাদ করার কোন অধিকার কারো থাকতে পারে না। গাছ-গাছড়ারও তো জীবন রয়েছে ; ইসলাম প্রাণহীন জড় পদার্থেরও অযথা অপব্যয় করার বিধান দেয়নি। এমনকি অত্যধিক পানি খরচ করাও নিষিদ্ধ হয়েছে।

বিশ্বজনীন ও স্থায়ী বিধান

এ হচ্ছে তামাম দুনিয়ার জন্য ও সর্বকালের জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রেরিত শরীয়াতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ শরীয়াত ধর্মীয় আকীদা ও কর্মসূচী সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় ব্যতীত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেসব মাযহাব ও শরীয়াতে বংশ, দেশ ও বর্ণ বিবেচনায় মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় তা কখনো বিশ্বজনীন হতে পারে না, কেননা এক বংশের লোক অপর বংশের লোক বলে গণ্য হতে পারে না, সারা দুনিয়ার লোক একটি মাত্র দেশে বসতি স্থাপন করতে পারে না। তাছাড়া হাবশীর দেশের কাল রং, চীনা যরদ রং ও 'ফিরিংগীর সাদা রং বদল করে দেয়া যায় না। এ কারণে এ ধরনের ধর্ম ও সমাজ-বিধান একটি বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। এসব ধর্ম ও সমাজ বিধানের মুকাবিলায় ইসলামী শরীয়াত হচ্ছে এক বিশ্বজনীন বিধান। যে কোন মানুষ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কালেমার উপর ঈমান আনলে সর্বপ্রকার অধিকার সহকারে মুসলিম কওমের মধ্যে দাখিল হতে পারে ; সেখানে গোষ্ঠী, ভাষা, দেশ, বর্ণ—কোন কিছুর বৈষম্য থাকবে না।

অধিকন্তু, এ শরীয়াত হচ্ছে একটি চিরন্তন বিধান। এর কানুনসমূহ কোন বিশেষ কওম ও কোন বিশেষ যুগের প্রচলিত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের উপর গড়ে ওঠেনি, বরং যে প্রকৃতির ভিত্তিতে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে, সেই প্রকৃতির নীতির বুনিয়াদেই গড়ে ওঠেছে এ শরীয়াত। এ স্বভাব-প্রকৃতি যখন সকল যুগে সকল অবস্থায় কায়েম রয়েছে, তখন এরই নীতির বুনিয়াদে গড়া আইনসমূহও সর্ব যুগে সর্ব অবস্থায় সমভাবে কায়েম থাকবে।

— সমাপ্ত —